জয়ন্তী

(উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

১৯২৯

[মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক :—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

প্রিণ্টার :—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড়

বেনারস-ব্র্যাঞ্চ

জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃগয়া

মংকুমা নূরপুরের মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন শিকারে যাইতেছিলেন। কেল্লার ভিতর তাঁহার প্রাসাদ। কেল্লাব সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠে শিকারের দল-বল প্রত্যুষে সমবেত হইয়াছিল। শীতকাল। শিকারীরা ও অপর লোকেরা তূলাভরা মির্‌জাই পরিয়া ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শিকারীদের পিঠে বন্দুক, হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি। শিকলে-বাঁধা তাজী কুকুর মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, ধমক খাইয়া আবার স্তব্ধ হইতেছে। কয়েক জনের হাতে চক্ষু-বাঁধা বাজ পাখী। শিকার-যাত্রার বিলম্ব নাই।

আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু সূর্য্যোদয় হয় নাই। উত্তর হইতে শীতল বায়ু বহিতেছে। সহসা কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। মন্‌সব্‌দার কেল্লার ফটক পার হইয়া বাহিরে আসিতেছেন, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্ধু ও কর্ম্মচারী। সকলেরই শিকারের বেশ। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দু-ই আছেন। পাগড়ীতে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মন্‌সব্‌দার নিকটে আসিলে সকলে তাঁহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। মন্‌সব্‌দার হাস্যমুখে মস্তকে হাত তুলিয়া কহিলেন, "তস্‌লীম!"

জলালুদ্দীনের বয়স চল্লিশ হইবে। দুই-চারি-গাছা গোঁফ-দাড়ি পাকিয়াছে। শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দিব্য সুপুরুষ, চক্ষে ওষ্ঠে দৃঢ়তাব লক্ষণ, দৃঢ়তাব সহিত নিষ্ঠুরতা। হাসিলেও চক্ষের কটাক্ষে ও অধরপ্রান্তে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন বিলীন হয় না।

পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তিব স্কন্ধে জলালুদ্দীন বাম হস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। সে হিন্দু ও বয়সে মন্‌সব্‌দারেব অপেক্ষা অনেক ছোট। তাহাকে একবার দেখিলে আবার তাহাব দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়। আকৃতি জলালুদ্দীনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, বক্ষ প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ। দেখিয়া বলবান কি না বুঝিতে পারা যায় না, তবে চলিবার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্র ও লঘুগামী মনে হয়। এরূপ রূপবান পুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আকারে ইঙ্গিতে বড় মোলায়েম, চক্ষের দৃষ্টি বড় কোমল ও মধুর। কণ্ঠের স্বরও সেইরূপ, কিছু আলস্যজড়িত, মৃদু, পুরুষকণ্ঠের পরুষতাশূন্য। মন্‌সব্‌দার যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "কেমন বিহারীলাল, কিছু শিকার পাওয়া যাইবে? দিন ত ভাল বোধ হইতেছে।"

বিহারীলাল চৌধুরী মহকুমার বড় জমিদার, মন্‌সব্‌দারের

প্রিয়পাত্র। তিনি মধুর অলস স্বরে কহিলেন, "শিকার ত পাশা খেলা, পড়ে ত পোয়া বারো, না পড়ে ত তিন কাণা।"

পাশে একজন মোসাহেব বলিল, "ঠিক বাত বাবু সাহেব, ঠিক বাত!"

শিকারের সরঞ্জাম মন্‌সব্‌দার ভাল করিয়া দেখিলেন। ঘোড়া, কুকুর, বাজ সব দেখিলেন। তাহার পর অশ্বে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। বিহারীলাল ও আর কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

কিছুদূর গিয়া অরণ্য। সকলে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে অরণ্য নিবিড়, অন্যত্র বিরল, কোথাও পল্বল, কোথাও বৃহৎ জলাশয়। একটা জলাশয় হইতে কতকগুলা বক উড়িয়া গেল। দেখিয়া যাহাদের হাতে বাজ ছিল তাহারা বাজের চক্ষু উন্মোচন করিয়া, বাজকে বলাকা দেখাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার পর অশ্বারোহণে বাজের পিছনে ছুটিল।

জলালুদ্দীন, তাঁহার সঙ্গিবর্গ ও কয়েকজন অনুচর সেদিকে না গিয়া সম্মুখে অশ্বচালনা করিলেন। বনের মধ্যে একটা মাঠ, সেইখানে একদল হরিণ চরিতেছিল। মৃগযূথ দেখিয়া শিকারীরা কুকুরের শিকল মুক্ত করিয়া দিল, সেই সঙ্গে এক দল অশ্বারোহী ধাবিত হইল।

জলালুদ্দীন, বিহারীলাল ও আর সকলে সেই পথ অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা বৃহৎ বন্য বরাহ তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া বেগে পলায়ন করিয়া বনে প্রবেশ করিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ সেই দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। আর সকলে অতটা লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ হরিণের দিকে ধাবমান হইল। মন্‌সব্‌দারকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেবল এক জন তাঁহার অনুগামী হইল।

নিবিড় শাখা প্রশাখা, লতা গুল্ম ভেদ করিয়া বরাহ ছুটিল, পশ্চাতে জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল। পাশাপাশি যাইবার পথ ছিল না, মন্‌সব্‌দার আগে, বিহারীলাল পশ্চাতে। দুই জনে বিশ ত্রিশ হাত ব্যবধান হইবে। কিছু দূর গিয়া বরাহ বিটপীশূন্য তৃণাবৃত পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইল। পরিসর অল্প, কিন্তু আক্রমণকারীর সুবিধা। মন্‌সব্‌দার বর্শা উদ্যত করিয়া বরাহকে আক্রমণ করিলেন।

তাঁহার নিমেষ মাত্র বিলম্ব হইয়া থাকিবে। বরাহ চকিতের মত ফিরিয়া অশ্বকে আক্রমণ করিল। জলালুদ্দীনের বর্শা বরাহের বক্ষে অথবা পার্শ্বস্থলে বিদ্ধ না হইয়া, তাহার পৃষ্ঠে অল্প লাগিয়া, ভূমিতে প্রোথিত হইল। বর্শা ফলক মুক্ত করিবার পূর্ব্বেই বরাহ বজ্রদন্ত দিয়া অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল। বিকট চীৎকার করিয়া অশ্ব পড়িয়া গেল।

মন্‌সব্‌দার লম্ফ দিয়া অন্য দিকে দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বর্শা হস্তচ্যুত হইল। অশ্বকে ছাড়িয়া বরাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

পশ্চাৎ হইতে বিহারীলাল দেখিলেন। বর্শার মুষ্টি দিয়া অশ্বকে দারুণ প্রহার করিলেন। অশ্ব লম্ফ দিয়া বরাহের সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল মন্‌সব্‌দার ও বরাহকে দেখিতেছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না। বর্শা-ফলক সজোরে বৃক্ষশাখায় লাগিয়া, বর্শা তাঁহার হস্ত হইতে ঠিক্‌রিয়া দূরে গিয়া পড়িল। যখন তাঁহার অশ্ব বরাহের সম্মুখে, তখন তিনি নিরস্ত্র— কেবল কটিতে তরবারি। তাহাও বাহির করিবার অবসর হইল না। বরাহ আবার ফিরিয়া বিহারীলালের অশ্বের উরু চিরিয়া ফেলিল। মন্‌সব্‌দারের ন্যায় বিহারীলালও লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। তখন বরাহ পাল্টাইয়া আবার মন্‌সব্‌দারকে আক্রমণ

করিল। তাঁহার হস্তে তরবারি, কিন্তু তরবারি দ্বারা তিনি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, কারণ, তিনি বরাহকে আঘাত করিলেও সে তাঁহাকে দীর্ণ করিয়া হত্যা করিত।

পলকের মধ্যে এই-সকল ঘটিতেছিল। বিহারীলাল কোন কথা না করিয়া, বেগে গিয়া বরাহের পিছনের দুই পা ধরিয়া, অমানুষী শক্তিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। বরাহের সম্মুখের দুই পা মাটিতে রহিল, পিছনের দুই পা শূন্যে উঠিল। দন্ত দিয়া আঘাত করিবার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। ঘুরিতে যায়, ঘুরিতে পারে না, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলালও ঘোরেন। সঙ্কটে পড়িয়া বরাহ গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মন্‌সব্‌দার কয়েক পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় তৃতীয় অশ্বারোহী উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "মকদুম শাহ, বিলম্ব করিও না। ইহাকে আর রাখিতে পারিতেছি না।"

মকদুম শাহ হস্তস্থিত বর্শা বরাহের পঞ্জরে আমূল বিদ্ধ করিলেন। তখন মন্‌সব্‌দারেরও বিস্ময় ও মোহ অপনীত হইল। লক্ষ্য করিয়া বরাহের হৃদয়ে তরবারি বিদ্ধ করিলেন। বরাহ গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

কিয়ৎকাল কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে জলালুদ্দীন বিহারীলালের নিকট গিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।"

বিহারীলাল কহিলেন, "সাহেব, ও কথা আর বলিবেন না, আমি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনিও আমাকে রক্ষা করিতেন।"

মন্‌সব্‌দার ঘাড় নাড়িলেন, "আমার বাহুতে এমন বল নাই যে,

বন্য বরাহকে তুলিয়া ধরিতে পারি। নিজের চক্ষে না দেখিলে আমি প্রত্যয় করিতাম না।"

"আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম্ শিকার ও পাশা খেলা সমান। সৌভাগ্যক্রমে তিন কাণা না পড়িয়া তিন ছয় আঠারো পড়িয়াছে।"

জলালুদ্দীন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমার এ ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না, কখন ভুলিব না। যদি ভুলি, তাহা হইলে যেন দোজখেও আমার স্থান না হয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনদেবী

মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকল শিকারী একত্র হইল। বিহারীলালের অদ্ভুত বাহুবলের কথা শুনিয়া সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলে বুঝিল, বিহারীলাল না থাকিলে মন্‌সব্‌দার বরাহ হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আহারাদির পর অর্দ্ধ দণ্ড বিশ্রাম করিয়া সকলে গৃহের অভিমুখে ফিরিল। ফিরিবার সময় অন্য পথ দিয়া দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়া চলিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল এবার বর্শা ছাড়িয়া বন্দুক লইলেন। জলে নানাজাতীয় পক্ষী, তাহারই শিকার হইবে। দুই জনের লক্ষ্য অব্যর্থ, পাখী উড়াইয়া মারিতে লাগিলেন। অনুচরেরা সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার পর অনেক দূর পর্য্যন্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় বন্দুকের আওয়াজে পাখী উড়িয়া গিয়া থাকিবে। মন্‌সব্‌দার ও বিহারীলাল দুই জনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতেছিলেন।

অকস্মাৎ উভয়ে দেখিলেন, বনের মধ্যে একপার্শ্বে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একটি রমণী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে। রমণী তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জলালুদ্দীন রমণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া অশ্বের গতি রোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অনুচরেরা বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে রমণীর প্রতি চাহিয়া ছিল।

সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় এই নারী কে? এমন স্থানে একাকিনী কি করিতেছে? ধনীর ঘরের পুরস্ত্রী না হউক, নীচজাতীয় দরিদ্র রমণী নহে। বস্ত্র ও বেশ বহুমূল্য না হউক, পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার। পরিধানের ধরণে বিদেশিনী বিবেচনা হয়। আলুলায়িত দীর্ঘকেশী, রূপে বন আলোকিত করিয়াছে। বিশাল নয়নের দৃষ্টি স্থির, ভয়শূন্য। অশ্বারোহী অস্ত্রধারী পুরুষদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল বা ত্রস্ত হইল না। যেমন দাঁড়াইয়াছিল সেইরূপ দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্‌সব্‌দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

রমণীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, কহিল, "আপাততঃ এই বনবাসিনী।"

"কি জাতি?"

"আমার পরিচয় জানিয়া আপনার কি হইবে?"

"আমি রাজকর্ম্মচারী। অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় লইবার আমার ক্ষমতা আছে।"

"আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা।"

"কোথায় নিবাস?"

"এইমাত্র ত বলিলাম—সম্প্রতি আমি এই বনবাসিনী।"

"এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছ?"

"কিছু দূর আপনার ন্যায় অশ্বারোহণে, অবশিষ্ট পথ পদব্রজে।"

"এমন জনশূন্য বনে তোমার কি প্রয়োজন?"

"বনবাসের বাসনা।"

"তুমি কি বনবাসের যোগ্য?"

"তাহার বিচারকর্ত্তা আপনি নহেন।"

মন্‌সব্‌দারের কৌতূহল—সেই সঙ্গে আরও কোন মনোভাব—

বাড়িতেছিল। কিছু রাগও হইতেছিল। রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে কহিলেন, "তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।" অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন, "এই স্ত্রীলোককে অশ্বে আরোহণ করাইয়া দুর্গে লইয়া চল।"

বিহারীলাল এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিঃস্পন্দ ছিলেন। এখন একটি মাত্র কথা কহিলেন, "কেন?"

স্বরে আলস্য নাই, কোমলতা নাই, তীক্ষ্ণ, তীব্র, স্পষ্ট কণ্ঠ। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় একবার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

মন্‌সব্‌দার বিহারীলালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এই রমণী একাকিনী, অসহায়, দুর্গের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইবে।"

বিহারীলাল প্রথম কথা কহিতেই রমণী তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। এখন অবনত নয়নে তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারকে কহিলেন, "ইনি একাকিনী হউন, অসহায় হউন, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নাই, স্বেচ্ছায় বাক্যালাপও করেন নাই। ইনি ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি আপনার মহলে যাইতে চাহেন সে কথা স্বতন্ত্র।"

মন্‌সব্‌দার আবার বিহারীলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি ক্রূর, কুটিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তে নিষ্ঠুরতার রেখা প্রস্তরে লৌহ-রেখার ন্যায় স্পষ্ট। তিনি কথা না কহিতেই রমণী বলিল, "বনচারিণী বলিয়া আমি অসহায়া বা একাকিনী এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমি কাহারও আশ্রয়প্রার্থী নহি, এবং আপনার বা আর কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাহি না। আপনারা উদ্দিষ্ট পথে গমন করুন। আমি একাকিনী হইলেও নিরপরাধিনী, আমাকে পীড়ন করিবেন না।"

মন্‌সব্‌দার কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বিহারী-লাল কহিলেন, "আমার অনুরোধ—আপনি ইঁহাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বে দুর্গে বা আর কোথাও পাঠাইবেন না, ইঁহার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিন্‌।"

জলালুদ্দীনকে কথা কহিতে অবসর না দিয়া রমণী বিহারীলালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারী হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই।"

একবার রমণীর ও বিহারীলালের চক্ষু মিলিল। অপর মুহূর্ত্তে রমণী বনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল।

মন্‌সব্‌দারের আদেশে অনুচরেরা অনেক অন্বেষণ করিল, রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

শিকার বন্ধ হইয়া গেল। বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন। পথে আর বড় একটা কথাবার্ত্তাও হইল না।

সেই দিন প্রভাতে, তৃণ হইতে শিশিরবিন্দু লীন হইবার পূর্ব্বে বিহারীলাল মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কেন? ভবিতব্য সর্ব্বযামী ব্যতীত কে জানে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহারীলাল ও পুণ্ডরীক

বিহারীলালের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানী। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের একজন বঙ্গপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ধনাঢ্য জমিদার। বিহারীলাল তাঁহাদের বংশধর ও সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারী।

অল্পবয়সে বিহারীলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। পিতৃব্য বনওয়ারিলাল ও তাঁহার পত্নী শিশু বিহারীলালকে লালন-পালন করেন। বনওয়ারিলাল সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, বিহারীলালকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্যায়ামাদি শিখাইবার জন্য উত্তম লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জমিদারী ও অপর সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া বিষয় অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সকল সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিহারীলাল সচ্চরিত্র, ধীর, বুদ্ধিমান। শিক্ষাগুণে বিলাস-লালসা বর্জ্জিত, আমোদ-প্রমোদে অধিক অনুরাগ নাই, তোষামোদ-প্রিয়তা নাই, অথচ কোনরূপ বিরক্তিও নাই। সকল বিষয় নিজে দেখিতেন, সকল দিকে নজর রাখিতেন। খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন বা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না বলিয়া প্রজারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সুখ্যাতি করিত।

বিহারীলালের কিশোর বয়সে পিতৃব্য তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই পিত্রালয়ে বধূর মৃত্যু হয়। বিহারীলাল এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। এখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। বিধবা পিতৃব্যা বাড়ীর গৃহিণী, বিহারীলালকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে বিহারীলাল চুপ করিয়া থাকিতেন, পরোক্ষে বলিতেন, বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

চৌধুরীদিগের বসতবাটী অট্টালিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরুষানুক্রমে বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছিল। তিন চার মহল বাড়ী, বিস্তর লোক-জন, সিংহ দরজায় হাতী বাঁধা, তাহার বাহিরে গোপালজীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ পুষ্করিণী। একদিকে অশ্বশালা, তাহার পাশে হস্তিশালা। আর এক দিকে প্রকাণ্ড বাগান, তাহাতে সকল জাতীয় ফল। অন্দর মহলে খিড়কীর দিকেও পুষ্করিণী ও প্রাচীর দিয়া ঘেরা বাগান। সিংহদ্বারের উপর সকাল-সন্ধ্যায় রোশন-চৌকী বাজিত। বৈঠকখানায় তিন চারিটা বড় বড় কামরা, চারিদিকে ঝাড়-লণ্ঠন, দেয়ালে ছবি, যেদিকে দেখ ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন। একটা ঘরে সকল রকমের বাদ্যযন্ত্র, যেখানে সর্ব্বদা মহফিল, মোজ্‌রা নাচ হইত। বিহারীলালের আমলে সে সকল অনেক কমিয়া গিয়াছিল, তবে দেওয়ালি ও হোলীতে বংশ-প্রথা-অনুসারে উৎসব হইত। অন্যান্য বিষয়ে, আহার-ব্যবহারে, আচার-বিচারে, কথাবার্ত্তায় চৌধুরী-বংশ বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল স্ত্রীলোকেরা হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় পরিতেন ও পুরুষেরা মাথায় টুপি কিম্বা পাগড়ী ব্যবহার করিতেন।

যে সময় বিহারীলালের মাতার মৃত্যু হয়, তখন বিহারীলাল নিতান্ত

শিশু। বালককে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইবার জন্য গ্রাম হইতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। তাহার কোলে একটি পুত্র, বিহারীলালের অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। নাম পুণ্ডরীক। বাল্যাবস্থায় ও কৈশোরের প্রথম অবস্থায় পুণ্ডরীক বিহারীলালের খেলার সাথী ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী। বিহারীলালের বয়স যখন ষোল ও পুণ্ডরীকের সাড়ে সতেরো, সেই সময় পুণ্ডরীকের মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে সে বিহারীলালের কাছে থাকিত।

পুণ্ডরীক ঠিক ভৃত্যের মত নয়। অপরের সাক্ষাতে বিহারীলালের সহিত সম্মান পূর্ব্বক কথা কহিত, আর কেহ না থাকিলে সমবয়স্ক বন্ধুর মত। বিহারীলাল তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও কেহ তাঁহাকে রূঢ় কথা বলিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। পুণ্ডরীক অল্প-স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি বড় ছিল না। তাহা না থাকুক, অন্য পক্ষে পুণ্ডরীকের সমকক্ষ কেহ ছিল না। একা বিহারীলাল ব্যতীত তাহার তুল্য বলবান সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। লাঠি-তরবারি খেলায়, বর্শা-বন্দুকে শিকার করিতে, অশ্বে আরোহণ করিতে সে অদ্বিতীয়। দৌড়িতে, সাঁতার দিতে তাহার সঙ্গে কেহই পারিত না।

দেখিতেও পুণ্ডরীক অদ্ভুত রকম। আকৃতি খর্ব্ব, মাথাটা প্রকাণ্ড, চক্ষু ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ, বাহু আজানুলম্বিত। তাহাকে অনেকে বিদ্রূপ করিয়া জাম্বুবান বলিত—কিন্তু আড়ালে, তাহার সাক্ষাতে নয়। একবার একটা নূতন ঘোড়সোয়ার অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীককে জাম্বুবান বলিয়াছিল, পুণ্ডরীক কিছু না বলিয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বিহারীলালের কাছে নালিশ হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "উত্তম করিয়াছে। আবার যদি বলে, তাহা হইলে

মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।" বিহারীলাল যেখানেই থাকুন, পুণ্ডরীকের পথ অবারিত। যে গোপনীয় কথা বিহারীলাল আর কাহাকেও বলিতেন না, তাহা পুণ্ডরীককে বলিতেন। পুণ্ডরীকও প্রাণান্তে তাঁহার কোন কথা প্রকাশ করিত না।

শিকারে বিহারীলালেরও দুই চারি জন লোক ছিল, কিন্তু পুণ্ডরীক যাইতে পারে নাই। শিকারের ঘটনা কাছারিতে, বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। পুণ্ডরীক বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বিহারীলালকে গিয়া বলিল, "লালজী"—বিহারীলালের ডাকনাম—"তুমি না কি আজ একটা শূয়োরের ঠ্যাং ধরিয়া তাহাকে নাচাইয়াছিলে? শূয়োরের গায়ে কি হাত দিতে আছে? মহাভারত!"

বিহারীলালও হাসিয়া ফেলিলেন, "অত বিচার করিলে মন্‌সব্‌দারের কি হইত?"

"বেড়ে হইত, বরাহরাজ মন্‌সব্‌দারের ভুঁড়ি ফুটিফাটা করিয়া দিত!" নরসিংহ যেমন নখর দিয়া হিরণ্যকশিপুর উদর চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক দুই হাতের নখ দিয়া সেইরূপ নিজের পেট চিরিবার ভঙ্গী করিল।

বিহারীলাল হাস্য সম্বরণ করিলে পুণ্ডরীক তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "আর সেই যে যক্ষ না মুনিকন্যা, সে কে?"

"জানি না" বলিয়া বিহারীলাল অন্যমনা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্‌সবদার জলালুদ্দীন

বাদ্‌শাহী আমলে দেশবিদেশ হইতে নানাজাতীয় বালিকা ও যুবতী আনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করা একটা ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসা আরবদিগের হাতে। ধাউ নামে সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকায় অপহৃত বা ক্রীত কিশোরী ও তরুণীর চালান পাঠাইত, এদেশে পঁহুছিতেই দালালেরা খরিদ করিয়া লইত, পরে সুবিধামত গ্রাহক দেখিয়া বিস্তর লাভে বিক্রয় করিত। শুধু যে সুন্দরীর আম্‌দানী এমন নহে, সব রকম রমণীর খরিদ্দার হইত। জঙ্গীবারের সীদী ও কাফ্রী স্ত্রীলোক সিন্ধুদেশে অনেক মূল্যে বিক্রয় হইত, পঞ্জাবে বেলুচিস্তানের ও মেক্রান দেশের স্ত্রীলোক পসন্দ। কেবল বাদ্‌শাহী সহর দিল্লীতে কিছু পড়িতে পাইত না। সৌখীন বিলাসী ধনী তমাশবীন অসংখ্য, রমণী বাজারে আসিলেই চীলের মত ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইত। পাঠানী, ইরাণী, তুর্কী, আরবী, সরকেশিয়ানী, ইহুদিনী, মিসরবাসিনী, ইটালীদেশীয়া রমণী, রুষিয়ার স্থূলাঙ্গী স্লাভ, ফ্রান্সের অঙ্গভঙ্গী-হাবভাব-চতুরা চপলা রমণী, স্পেনের কৃষ্ণকেশী কৃষ্ণতারচক্ষু দীর্ঘায়তনী সুন্দরী, ইংলণ্ডের নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশী তরুণী—এমন দেশের স্ত্রীলোক ছিল না যে, বাদ্‌শাহের হরমে ও আমীর-ওম্‌রাহের মহলে মিলিত না। চিড়িয়াখানায় যেমন সকল দেশের পশু-পক্ষী থাকে, দিল্লীর প্রাচীরাবৃত জেনানায় সেই রকম সকল দেশের স্ত্রীলোক থাকিত।

জলালুদ্দীন দিল্লীর একজন ধনীর বেলুচী দাসীর পুত্র। জলালুদ্দীনের পিতা সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে মাতারও মৃত্যু হয়। জলালুদ্দীনের পিতার এক বন্ধু বালককে আশ্রয় দেন। যখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর, তখন সুবেদার ফইয়াজ আলি সুবা বাঙ্গালায় যাইতেছিলেন। জলালুদ্দীনের পিতার বন্ধুর সুপারিসে সেই সঙ্গে জলালুদ্দীন সিপাহী হইয়া গেলেন। জলালুদ্দীন চতুর, পরিশ্রমী, উপরওয়ালা কর্ম্মচারীদের তোষামোদ করিতে পটু। তাঁহার উন্নতি দ্রুত হইল। দশ বার বৎসরের মধ্যে মন্‌সব্‌দার হইলেন। নূরপুরে নিযুক্ত হইবার সময় রাজকর্ম্মচারী জলালুদ্দীনের যথেষ্ট প্রশংসা। যেমন কর্ম্মে দক্ষ, তেমনি রাজশাসনে মজবুত। তাঁহার প্রতাপে মহকুমার লোক ও জমিদারেরা থরহরি কাঁপিত।

সামান্য চাকরী হইতে বড় কর্ম্ম হইলে যে সকল দোষ হয় জলালুদ্দীনের সে সকল দোষ ছিল। তাহার উপর হিন্দুবিদ্বেষী ও দুষ্ট-চরিত্র। বিহারীলাল ও কয়েক জন হিন্দু তাঁহার প্রিয়পাত্র, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করিতেন। তবে তাঁহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার সময় সুবেদার ফইয়াজ আলি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "জলালুদ্দীন, তোমার যোগ্যতাসম্বন্ধে আমি কোন সংশয় করি না, কিন্তু তোমার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাদ্‌শাহ প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বা জাতি বিচার করেন না, হিন্দু-মুসলমান তুল্য জ্ঞান করেন। এ বিষয়ে কোন অনুযোগ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি নারাজ হইবেন।"

এ কথা মন্‌সব্‌দারের স্মরণ ছিল।

জলালুদ্দীনের তিন বিবি—মলেকা, ফাতেমা, খদিজা। তিন বেগমের স্বতন্ত্র মহল, কিন্তু ফাতেমা স্বামীর হৃদয়ের অনেকটা স্থান দখল করিয়াছিলেন এবং জেনানায় আসিলে জলালুদ্দীন অধিকাংশ সময় তাঁহার মহলেই থাকিতেন। ফাতেমা যে সপত্নীদিগের অপেক্ষা সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও নানা প্রকার কৌশলে স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতেন। তাঁহার বাবর্চিখানায় যেমন পাক হইত, এমন আর কোন মহলে হইত না। তাহার কারণ, ফাতেমা নিজে উত্তম রন্ধন করিতে জানিতেন এবং বাঁদীদিগকে নিজে শিখাইতেন। তেমন জর্‌দা পোলাও ও মুরগীর দোপেয়াজা জলালুদ্দীন কোথাও খান নাই। তেমনি তোফা সরাব ও শর্‌বত। ফাতেমা যখন স্বহস্তে শর্‌বত প্রস্তুত করিতেন তখন জলালুদ্দীন মুগ্ধ নয়নে তাঁহার হস্তচালনা নিরীক্ষণ করিতেন; কোন সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, "বিবি, তোমাকে এমন হুনর কে শিখাইল?"

ফাতেমা বলিতেন, "মার কাছে শিখিয়াছি। তিনি বাদ্‌শাহের হাবেলীতে পাচিকার কর্ম্ম করিতেন।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিন্তু একটু কৌতুকের জন্য ফাতেমা ঐরূপ করিতেন। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। মন্‌সব্‌দার পদস্থ হইয়া নিজের জন্মবৃত্তান্ত না ভুলিয়া যান ও পত্নী পাচিকা-কন্যা বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা না করেন, ফাতেমা এইরূপ কৌশলে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

শিকারের পর সন্ধ্যার সময় জলালুদ্দীন অন্তঃপুরে আসিলে ফাতেমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ শিকার কেমন হইল?" বেগম সমস্তই অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নের ভাবে বিবেচনা হয়, যেন তিনি কিছুই জানেন না।

মন্‌সব্‌দার সব কথা বলিলেন, কেবল বনে যে-রমণীকে দেখিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না। তিনি ফাতেমাকে একটু ভয় করিতেন।

ফাতেমা মনের অঞ্চলে একটা গাঁইট বাঁধিলেন।

অল্পক্ষণ বসিয়া জলালুদ্দীন উঠিয়া গেলেন। উঠিবার সময় কহিলেন, "সদরে কাজ আছে। এলাকা হইতে কিস্তী আসিবার কথা আছে।"

তিনি চলিয়া গেলে বেগম পুরাতন বিশ্বস্ত বাঁদী নস্‌রৎকে ডাকিলেন। সে আসিলে দরজা বন্ধ করিয়া বিবিতে বাঁদীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বাহিরে আসিয়া মন্‌সব্‌দার এলাকার কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সঙ্গে শিকারে বম্‌জান নামক পুরাতন ভৃত্য গিয়াছিল। তাহাকে ডাকাইয়া গোপনে তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন।

এ রাত্রে অন্দরে বাহিরে গোপনীয় পরামর্শের পালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গিরিগুহায়

রেবতী নদীর তীরে ত্রিকূট পর্ব্বত। নদীর স্রোতে অত্যন্ত বেগ, কিন্তু নদী তেমন প্রশস্ত নহে। পর্ব্বতের এক পার্শ্ব ধৌত করিয়া নদী প্রবাহিত। কিছু দূরে পর্ব্বতের উপর মন্দির। গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক দেবতা দর্শন করিতে আসিত। পর্ব্বতের আর-এক দিকে বন-জঙ্গল, সেদিকে বড় একটা লোকের যাতায়াত ছিল না, সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র-ভল্লুক আসিত। নিকটে লোকালয় ছিল না।

এক দিন মধ্যাহ্নের সময় এক ব্যক্তি নদী পার হইয়া পাহাড়ের পথে মন্দিরে না গিয়া সেই দিকে গমন করিল। সাধারণ পথিকের বেশ, হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলে সাধারণ লোক মনে হয় না। দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত ললাট, ভ্রু নিবিড়, চক্ষু তীব্রোজ্জ্বল, মুখের ভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ক্ষমতাশালী পুরুষের সকল লক্ষণ বিদ্যমান। এ পথে এমন পথিক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়া পথিক গমন করিতেছিলেন, তাহাতে বিবেচনা হয়, পথ তাঁহার পরিচিত। পর্ব্বতের নিকটে গিয়া পথিক দেখিলেন, পথের আর কোন চিহ্ন নাই। তাহাতে নিরুৎসাহ বা নিরস্ত না হইয়া তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কিছু দূর গমন করিয়া

পথিক একটা গিরিগুহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাধারণতঃ যেরূপ গিরিগুহা হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ। একটু অপেক্ষা করিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া, পথিক সাবধানে সেই গুহায় প্রবেশ করিলেন।

পথিক পদ গণনা করিতেছিলেন। সপ্তদশ পদ গণনা করিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে কিছু অন্ধকার। পথিক বস্ত্রের মধ্য হইতে বাতি বাহির করিয়া জ্বালিলেন। আলোক দিয়া উত্তমরূপে দেখিয়া একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া লইয়া পাহাড়ে বার কয়েক আঘাত করিলেন। আঘাতে সঙ্কেতের ভাব। আঘাত করিয়া বাতি নিবাইয়া দিলেন।

অল্পক্ষণ পরে পাহাড়ের ভিতর দিক হইতে কয়েক বার শব্দ হইল। পথিক আবার প্রস্তরখণ্ড দিয়া আঘাত করিলেন, কিন্তু এবার শব্দের সঙ্কেত অন্যরূপ।

নিঃশব্দে, অল্পে অল্পে অলক্ষিত দ্বার মুক্ত হইল। দ্বারে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, বাম হস্তে আলোক, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। পথিককে দেখিয়া সে তরবারি ও মস্তক নত করিল, নিঃশব্দে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, পথিক তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

মুক্ত দ্বার আবার নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কিছু দূর গিয়া পর্ব্বতের ভিতর একটি প্রকোষ্ঠ। কয়েকটি দীপে আলোকিত। প্রকোষ্ঠে চার জন লোক মৃগচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট। পথিককে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। পথিক দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এই চার ব্যক্তি পথিকের তুল্য তেজস্বী না হউক, কেহই সামান্য লোকের মত নহে। বেশভূষা আড়ম্বরশূন্য, কিন্তু সকলেরই মুখে কিছু

বিশেষত্ব আছে। সকলেই মনস্বী, গম্ভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী। যে পথিক সর্ব্বশেষে আগমন করিলেন তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন। তাঁহাকে যে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে দ্বারের নিকট ফিরিয়া গেল।

পথিক কহিলেন, "আমাদের লোকেদের নিকট সকল দেশের সংবাদ পাইয়াছি। আপাততঃ কোথাও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কোথাও বিশেষ অত্যাচার নাই। তবে এ সুবার সংবাদ তেমন সন্তোষজনক নহে। নূতন সুবেদার আসিয়াছে, সে লোভী ও অত্যাচারী। নূরপুরের মনসব্দার দূরের কয়েক এলাকায় গোপনে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। অন্য দোষও আছে। বিশেষ, সে হিন্দুবিদ্বেষী। পুরাতন সুবেদার ও বাদশাহের ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কিছু করে নাই। এখন সে ভয় কতক দূর হইয়াছে। সুবেদার স্থানান্তরিত হইয়াছেন, বাদশাহ্ অনেক দূরে।"

চার জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কহিল, "বাদশাহের চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র। তিনি শুনিতে বা জানিতে কতক্ষণ?"

পথিক কহিলেন, "সত্য। কিন্তু বাদশাহ সত্যও শুনিতে পারেন, মিথ্যাও শুনিতে পারেন। যে অত্যাচার করে, সে অর্থব্যয় করিয়া কর্ম্মচারীর মুখ বন্ধ করিতে পারে, অথবা তাহাকে দিয়া মিথ্যা কথাও বলাইতে পারে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "বাদশাহ আমাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। সে বিষয়ে কোন সংবাদ আছে?"

"আছে। গুপ্তচর বিভাগের নায়েব মন্ত্রীর নিকট খবর তলব করিয়াছেন। চরেরা সর্ব্বত্র মুখে মুখে আদেশ পাইয়াছে, কিন্তু কোনরূপ পরোয়ানা জারি হয় নাই। বাদশাহও কোনরূপ ফারমান কিম্বা ইর্‌যাদ প্রচার করেন নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ আছে?"

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি পথিক একবার বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজের কোন অশঙ্কা হইতেছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "কিছু মাত্র না। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে, অথবা কোনও কালে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে, তাহা করিতে পারিতাম না। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য, যে কার্য্যে আমরা নিযুক্ত আছি, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা আছে কি না।"

"তোমার কথাতেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়, কিছু মাত্র না। যে কয়জন আমরা এখানে উপস্থিত আছি, যদি এই দণ্ডে নিহত হই, তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের সম্প্রদায়ের সকল কথাই তোমরা অবগত আছ, তবে এ সংশয় কেন? বাদশাহের বাদশাহী নিমেষের মধ্যে যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের কর্ম্ম কখন নিবারিত হইতে পারে না, কারণ আমাদের কাহারও কোনরূপ স্বার্থ নাই, অথচ আমাদের সঙ্কল্পও বিচলিত হয় না। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম একজন না পারে আর-একজন করিবে।"

অপর দুই ব্যক্তি নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, একটিও কথা কহে নাই।

পথিককে যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল। সঙ্কেত-মত নিকটে আসিয়া পথিককে একটি অঙ্গুরী দেখাইল। দেখিয়া পথিক কহিলেন, "এখানে লইয়া আইস।"

দ্বাররক্ষক ফিরিয়া গিয়া একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিল।

বনে মন্‌সব্‌দার ও বিহারীলাল যাহাকে দেখিয়াছিলেন এই সেই রমণী!

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?"

রমণী স্পষ্ট মধুর স্বরে কহিল, "আদেশ পালন করিয়াছি।"

"উত্তম। তোমার আবাসস্থান কেহ অবগত আছে?"

"আপনি আছেন।"

এইবার প্রথম পথিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। পথিক কহিলেন, "আমি না জানিলে তুমি কেমন করিয়া যাইতে? আর কেহ জানে?"

"বলিতে পারি না, কিন্তু আর কেহ জানে বলিয়া মনে হয় না।"

"যাহাদের কথা বলিয়াছিলাম তাহাদিগকে দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

"বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চেষ্টা করিতে পারি নাই।"

পথিক কহিলেন, "আবশ্যক হইলে তোমায় সংবাদ দিব অথবা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রমণী চলিয়া গেল। পথিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর চারি জনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। কেহ কাহারও নাম করিলেন না, ব্যক্তিগত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলেই অজ্ঞাত রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান—এক প্রকার

অলোকসামান্য রূপবতী বনবাসিনীকে দেখিবার বাসনা দুই ব্যক্তির চিত্তে বলবতী ছিল—বিহারীলাল ও জলালুদ্দীন। বিহারীলালের মনে কোন পাপ ছিল না, কেবলমাত্র কৌতূহল। রমণী কে? কোথা হইতে একাকিনী বনের মধ্যে আসিল? সত্য কি বনবাসিনী, না, শুধু ভ্রমণ করিতে বনে আসিয়াছিল? বনে ত কোথাও বাসস্থান নাই, আর রমণী যেই হউক, যুবতী, একা এমন স্থানে আসিবে কেন? এই রকম নানা কথা বিহারীলালের মনে হইত, তাহার পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হইত। সেই সঙ্গে যে হৃদয়ের একটু চঞ্চলতা হইয়াছিল তাহা নিজের কাছে স্বীকার করিতে চাহিতেন না। জলালুদ্দীনের কেবল কৌতূহল নহে, তাঁহার মনে হইতেছিল—এই রমণীর উপযুক্ত স্থান বনে নহে, তাঁহার অন্তঃপুরে। হইলই বা হিন্দু? স্বয়ং বাদশাহেরা ত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়া হরমে রাখিতেন। কেহ বা যবনী হইত, কেহ বা হিন্দুই থাকিত। ছলে হউক, বলে হউক, এই রূপসী বনবাসিনীকে তাঁহার গৃহবাসিনী করিতে হইবে। বনের হরিণীকে সোনার শিকলে বাঁধিয়া অন্দরের উদ্যানে রাখিতে হইবে। সুভানল্লা! এমন অওরত মনসব্দারের গৃহ ব্যতীত আর কোথায় শোভা পাইবে?

মৃগয়ার পর অষ্টাহ অতীত হইল। একদিন মধ্যাহ্নের পর বিহারীলাল পুণ্ডরীককে ডাকিয়া কহিলেন, "অশ্বারোহণে ভ্রমণে

যাইব। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে, আর কেহ না। অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দাও।”

পুণ্ডরীক বাহিরে রৌদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, “বটেও ত! রৌদ্রটা বহিয়া যাইতেছে!” বলিয়া বাহিরে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই অশ্ব দরজায় আসিল। পুণ্ডরীক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, সশস্ত্র হইয়া হাজির। বিহারীলাল উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, অস্ত্রের মধ্যে তরবারি। তাঁহার বেশ লক্ষ্য করিয়া পুণ্ডরীক মনে মনে বলিল, ‘কোথাও নিমন্ত্রণ আছে।’ মুখে কিছু বলিল না।

বিহারীলাল বেগে অশ্বচালনা করিয়া বনের অভিমুখে চলিলেন, পুণ্ডরীক ঠিক তাঁহার পশ্চাতে। বিহারলীলকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুণ্ডরীক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আজও কি শিকার না কি?”

“না”, বলিয়া বিহারীলাল অশ্বের বেগ শিথিল করিলেন। পুণ্ডরীক তাঁহার পাশে আসিল। বিহারীলাল তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমি সেই বনবাসিনীকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি কোন কথা প্রকাশ করিবে না জানিয়া তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছি।”

পুণ্ডরীকের ক্ষুদ্র চক্ষু বিস্ময়ে একটু বড় হইল। বলিল, “তাহাকে দেখিয়া কি হইবে? কে, কোন্ জাতি, কিছুই জান না। আর তুমি ত কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে চাও না।”

“এই স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের মত নয়। জাতিতে ক্ষত্রিয়। যদি দেখা হয়, তাহা হইলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু বনে ত বাসস্থান নাই।”

“তবে কোথায় খুঁজিবে? হয়ত একদিন ইচ্ছা করিয়া কিম্বা পথ

ভুলিয়া বনে আসিয়াছিল, আবার গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি? পথে ঘাটে বনে যে-কোন রমণীকে দেখিলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে?”

বিহারীলাল কহিলেন, “আমি কখনও কোন রমণীর সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি নাই, কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু এ রমণী অপরের মত নয়।”

আবার এই কথা। পুণ্ডরীক বিহারীলালের মুখ দেখিয়া ক্ষান্ত হইল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

যেস্থানে রমণীকে দেখিয়াছিল তাহার কিছু দূরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, অশ্বকে একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া বিহারীলাল পুণ্ডরীককে কহিলেন, “তুমি এইখানে থাক। আমি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।”

এবার পুণ্ডরীক রাগিয়া গেল। “তবে আমাকে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল?”

“প্রয়োজন হইতে পারে, এখন নয়।”

“আর তোমাকে একা পাইয়া যদি কেহ তোমার গলা টিপিয়া রাখে?”

বিহারীলাল একটু হাসিলেন। “তুমি কি বিশ্বাস কর, এক জন আমাকে হত্যা করিবে? আর কে আমার এমন শত্রু আছে?”

পুণ্ডরীক মুখভঙ্গী করিল। “বনে যেমন তোমার ঐ দেব কি দানব-কন্যা আছেন, তেমনি দস্যু-তস্কর মহাশয়েরাও এখানে আশ্রয় পাইতে পারেন। এক জন না হইয়া যদি দশ জন হয়?”

“তাহা হইলে তোমাকে ডাকিব।”

“দূরে হইলে আমি কেমন করিয়া শুনিতে পাইব?”

বিহারীলাল পকেট হইতে একটি ছোট রূপার বাঁশী বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুণ্ডরীক কহিল, "তবু ভাল! আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে।"

বিহারীলাল হাসিলেন; পুণ্ডরীকের কথায় তিনি রাগ করিতেন না।

বিহারীলাল পদব্রজে চলিয়া গেলেন। নিকটে একটা বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল। পুণ্ডরীক আপনার মনে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে তাহার উপর উঠিল। গাছে উঠা বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী।

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বিহারীলাল যে স্থানে বনচারিণী রমণীকে দেখিয়াছিলেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন। কেহ কোথাও নাই। রমণী যে সে-দিনও সেই সময় সেই স্থানে থাকিবে, বিহারীলাল এমন আশা করেন নাই। তিনি জানিতেন, বনে কোথাও বাসস্থান নাই। তবে যদি রমণী একদিন বনে আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর-একদিনও আসিতে পারে। এ-দিকে না আসিয়া অন্য কোনও দিকে গিয়া থাকিতে পারে। বিহারীলাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

গাছের উপর বসিয়া পুণ্ডরীক দেখিতেছিল। কখনও বিহারী-লালকে দেখা যায়, কখন তিনি বৃক্ষের, কখন ঘনবিন্যস্ত গুল্মলতাদির অন্তরালে অদৃশ্য হন, আবার অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে দৃষ্টিগোচর হন। পুণ্ডরীক অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দেখিতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে বিহারীলাল একটা পল্বলের ধারে উপস্থিত হইলেন। তরুশাখা-বিলম্বিত পুষ্পিত লতা জলের উপর দুলিতেছে, পত্র ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলের ধারে ডাকপাখী, জলের ভিতর পানকৌড়ি ডুব দিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে।

সেই স্থানে বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই রমণী! হস্তে অর্দ্ধবিকশিত পদ্মফুল, জলের দিকে চাহিয়া পক্ষীর ক্রীড়া দেখিতেছে।

সেই রমণী কি? বিহারীলাল তাহার পৃষ্ঠদেশ দেখিয়াছিলেন, মুখ দেখিতে পান নাই, কিন্তু রমণী যে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সুন্দরী, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। বিহারীলাল দাঁড়াইলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কেমন করিয়া রমণীর সম্মুখে যাইবেন, কেমন করিয়া কোন্ ছলনায় তাহাকে সম্ভাষণ করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

বৃক্ষশাখা হইতে তীক্ষ্নদৃষ্টি পুণ্ডরীক তাঁহাকে দেখিতেছিল। রমণীকে দেখিতে পায় নাই।

বিহারীলাল কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় রমণী মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন বিহারীলাল অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিতমুখে, অতি মধুর স্বরে কহিল, "আজও কি মৃগয়ায় আসিয়াছেন? তাহা হইলে একা কেন?"

বিহারীলাল কহিলেন, "আজ মৃগয়ার জন্য আসি নাই।"

রমণীর মুখে অল্প হাসি লাগিয়া ছিল। "তবে কি উদ্দেশ্যে বনে আসিয়াছেন?"

"এ কথা আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি। আমি আমি পুরুষ, যথেচ্ছা গমন করিতে পারি, প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারি। আপনি স্ত্রীলোক, যুবতী, সুন্দরী, একাকিনী; আপনি কোন্ সাহসে এই বনে আগমন করেন? সেদিন আপনি বলিতেছিলেন আপনি এই বনে বাস করেন, কিন্তু এখানে বাসস্থান কোথায়? আমি ত বনের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি।"

রমণী কহিল, "আপনার কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর হইল না। আপনি কি আমাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?"

বিহারীলাল কহিলেন, "আমার কোনরূপ অসদভিপ্রায় নাই। আপনি যদি বাস্তবিক একাকিনী এবং এই বনেই বাস করেন, তাহা হইলে যদি কোনরূপে আপনার সহায়তা করিতে পারি তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

"আপনি অপরাধ লইবেন না, কিন্তু আমি ত কাহারও সাহায্য-প্রার্থী নহি। আর সেদিন মন্‌সব্‌দারের সহিত যে-কথা হইয়াছিল, তাহাতে আপনি বুঝিয়া থাকিবেন যে, আমি কাহাকেও আমার পরিচয় দিতে চাই না। যদি সেই ইচ্ছা থাকিবে, তাহা হইলে এমন স্থানে আসিব কেন?"

বিহারীলাল অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মন্‌সব্‌দারকে চেনেন?"

"চিনিতাম না, এখন চিনি। আপনিও অপরিচিত নহেন।"

বিহারীলাল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় জানিলেন কেমন করিয়া?"

"তাহা বলিব না, কিন্তু আপনি যে বড় মহলের জমিদার চৌধুরী বিহারীলাল তাহা জানি।"

বিহারীলাল অবাক্‌। বলিলেন, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে কেমন করিয়া চিনিলেন কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না। আপনি বিদেশিনী, সম্প্রতি এই বনে আসিয়াছেন, গ্রামে আপনার যাতায়াত নাই। গ্রাম হইতে কি কেহ আপনার নিকট আসে?"

রমণী কহিল, "প্রশ্ন করা আপনার অভিরুচি, উত্তর দেওয়া

আমার ইচ্ছা। আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই আপনার পরিচয় পাইয়াছি। আপনিও যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে নিষেধ করিতে পারি না, নিবারণও করিতে পারি না। তবে আমার পরিচয় পাইলে আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয় সেইরূপ করিবেন।"

বিহারীলাল কহিলেন, "যদি দর্শনসুখে বঞ্চিত না করেন তাহা হইলে আমি কৌতূহল সম্বরণ করিব।"

রমণী কহিল, "শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আপনি সত্যবাদী সচ্চরিত্র জানি। আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ঘটনাধীন। আবার দেখা হইতে পারে, নাও হইতে পারে। হয়ত এই বনে, হয়ত অন্যত্র সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আপনি সেজন্য চেষ্টিত হইবেন না, তাহাতে কোন ফল হইবে না। আপনি যে আমার সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন; কিন্তু আপনাকে বলিলে ক্ষতি নাই যে, আমি একাকিনী নহি, অসহায়ও নহি, এবং প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" বিহারীলাল যাহা বলিয়াছিলেন, রমণী ঠিক সেই কথা বলিল। বলিবার সময় বিহারীলালের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কথা কহিতে কহিতে রমণী বিহারীলালের সঙ্গে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিল। অবশেষে কহিল, "এখন আপনি গৃহে ফিরিয়া যান। আমার অনুরোধ, আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টা করিবেন না। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি, জানিবার জন্য কোন লোক নিযুক্ত করিবেন না।"

"আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি," বলিয়া বিহারীলাল রমণীকে সসম্ভ্রমে

সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীও আর এক দিকে চলিয়া গেল।

বৃক্ষে বসিয়া পুণ্ডরীক সব দেখিল। রমণীর রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আপনা-আপনি বলিল, "বনের ভিতর এ কি মূর্ত্তি! অপ্সরা না বিদ্যাধরী? লালজীর ত আর রক্ষা নাই, ইহারই মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে।"

বিহারীলাল ফিরিতেছেন দেখিয়া পুণ্ডরীক আস্তে আস্তে নামিয়া ঘোড়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিহারীলাল আসিয়া দেখেন, পুণ্ডরীককে যেখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে। বিহারীলাল অশ্বে আরোহণ করিয়া বিনা বাক্যে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুণ্ডরীক গম্ভীর মুখে মৃদু স্বরে বিহারীলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালজী, ওটা কি মানুষী?"

বিহারীলাল চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

"ওই যে, যাহার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিল?"

বিহারীলাল ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া দেখিলে? তোমাকে ত আমার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

"আমি ত তোমার সঙ্গে যাই নাই। যেখানে থাকিতে বলিয়াছিলে সেখানেই ছিলাম।"

"তবে দেখিলে কেমন করিয়া?"

"গাছে উঠিয়া। তুমি ত আমাকে গাছে উঠিতে বারণ কর নাই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান—আর-এক প্রকার

মনসবদার জলালুদ্দীনও বনচারিণী রমণীকে দেখিতে উৎসুক, কিন্তু তিনি শুধু দেখিয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। এই কারণে বিহারীলাল যেরূপ বনবাসিনীকে দেখিবার জন্য একা গিয়াছিলেন, জলালুদ্দীনের মনে সেরূপ কল্পনার উদয় হয় নাই। তাঁহার হিসাবে ইহাও এক রকম শিকার। রমণীকে ধরিয়া আনিবেন, তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, নিজে যাইবেন কি না সেই বিচার করিতেছিলেন। অবশেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, নিজে যাওয়া সৎপরামর্শ নহে, প্রকাশ হইলে তাঁহার অখ্যাতি হইবে। অন্য কোন উপায়ে রমণীকে আনয়ন করিয়া মহলে রাখিলে কোন গোল হইবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনসবদার রমজানকে ডাকিলেন। কহিলেন, "সেদিন রাত্রে কি কথা হইয়াছিল মনে আছে?"

"জনাবালি, সব মনে আছে।"

"সেই অওরতকে জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনিতে হইবে। আমি তাহাকে শাদি করিব। কোরান শরিফে চার শাদির হুকুম আছে।"

"খোদাবন্দ, আপনি চার শাদি ছাড়া যত ইচ্ছা নিকা করিতে পারেন।"

"এ কাজের ভার তোমার উপর। আমি নিজে যাইব না। তাহাকে আনিয়া শাদি করিলে পর আর কোন গোল হইবে না।"

রমজান ঝুঁকিয়া কুর্নীশ করিল, বলিল, "বান্দা হাজির, যেমন হুকুম করিবেন তাহাই হইবে।"

"সঙ্গে আর তিন জন লোক লইবে, হুঁশিয়ার, আর মজবুত সিপাহী। দুই জন হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু লোক কিছু বেশী থাকিলে দোষ নাই। অওরতকে দেখিতে পাইলেই ধরিবে। বাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিবে, যাহাতে গোলমাল না করে। দিনের বেলা বনের বাহিরে আনিবে না, রাত্রে ঘোড়ায় সওয়ার করাইয়া লইয়া আসিবে। ফটকের প্রহরীকে বলিবে, ফটক খোলা থাকে।"

চার জন কেল্লা হইতে এক সঙ্গে বাহির হইল না, তাহা হইলে লোকে লক্ষ্য করিতে পারে। একে একে, কিছু কালবিলম্ব করিয়া বাহির হইল। মন্‌সব্‌দারের লোকেরা অস্ত্র না লইয়া পথে বাহির হইত না, সুতরাং এই কয়জন যে সশস্ত্র যাইতেছে তাহাতে কোন কথা উঠিল না। চার জন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া গিয়া জঙ্গলের নিকট একত্র হইল। সর্দ্দার রম্‌জান।

মৃগয়ার দিন রমণীকে যেখানে দেখা গিয়াছিল সে-স্থান হইতে কিছুদূরে রম্‌জান দাঁড়াইল। কহিল, "সকলের যাইবার প্রয়োজন নাই। এক জন আমার সঙ্গে আইস, আর দুই জন এখানে অপেক্ষা কর। আবশ্যক হয় ডাকিব।"

একজন বলবান ব্যক্তিকে রম্‌জান নিজের সঙ্গে লইল। অপর দুই জন প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রম্‌জান ও তাহার সঙ্গী অগ্র-পশ্চাতে দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া চলিল। রমণীকে বিহারী-লাল যেস্থানে দেখিতে পাইয়াছিল ইহারাও তাহাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইল। প্রভেদ এই যে, এবার উপবিষ্ট নহে এবং তাহার পৃষ্ঠও দেখা যাইতেছে না। দাঁড়াইয়া যেন তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। রম্‌জান বুঝিল, রমণীকে বলে ধরিতে হইবে, কৌশলে হইবে না। সম্মুখে গিয়া সেলাম করিল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?"

রম্‌জান কোন কথা ঘুরাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল না। কহিল, "আমরা মন্‌সব্‌দার সাহেবের সিপাহী। তাঁহার আদেশে আপনাকে তাঁহার মহলে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

রমণীর মুখে অল্প হাসি, চক্ষে কৌতুকের কটাক্ষ। কহিল, "শিকারের দিন তুমি ছিলে?"

রম্‌জান বলিল, "ছিলাম বই কি। সেইজন্যই আপনাকে সহজে চিনিতে পারিলাম।"

"সেদিনও মন্‌সব্‌দার সাহেব আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন কেন?"

"তিনিই জানেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন ফল নাই।"

"আজ তিনি আসেন নাই কেন? আমি কেমন করিয়া জানিব, তোমরা তাঁহার লোক? আমার মনে হয়, তোমরা দস্যু, অর্থলোভে আমাকে ধরিতে আসিয়াছ। তোমাদের কাছে কোন পরোয়ানা অথবা হুকুম আছে?"

রম্‌জান তলওয়ারে হাত দিয়া বলিল, "এই আমার পরোয়ানা।"

"তোমরা বীর বটে, স্ত্রীলোককে অস্ত্র দেখাইয়া ভয় দেখাও।"

রমণীর স্বর ঘৃণাপূর্ণ, তাহার কথা রম্‌জানের কর্ণে তীব্র কশাঘাতের মত লাগিল।

রম্‌জান কহিল, "বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? আমাদের সঙ্গে চলুন।"

"যদি না যাই?"

"বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

"পথে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিব।"

"মুখ বন্ধ করার উপায় আছে। আপনি মন্‌সবদারের বন্দী, কে

আপনাকে রক্ষা বা মুক্ত করিবে, কাহার এমন মাথার উপর মাথা আছে ?”

রমণী হাসিল,—নির্ভয়ের, আমোদের হাসি। কহিল, “মন্‌সব্‌দার আমাকে বন্দী করিবেন ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বেগম করিতে চাহেন।”

“স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যান ত আমরা আপনাকে বেগম বলিয়াই সম্মানের সহিত লইয়া যাইব। নহিলে আপাততঃ বন্দী, পরে বেগম।”

“আমার অপরাধ ?”

“অপরাধ অত্যন্ত কঠিন। আপনি মন্‌সব্‌দার সাহেবের দিল্‌ চুরি করিয়াছেন।”

রমণী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, “কেয়া খুব ! রসিক সিপাহী তোমার তরক্কী হওয়া উচিত।”

রম্‌জান কহিল, “আপনাকে লইয়া গেলে নিশ্চয় হইবে।”

রম্‌জান অগ্রসর হইয়া রমণীর হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্যুতের ন্যায় রমণীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, “নরাধম, আমাকে স্পর্শ করিলে মরিবি !”

রমণী করতালির শব্দ করিল। তৎক্ষণাৎ রমণীর পশ্চাৎ হইতে বৃক্ষশাখা সরাইয়া দুই ব্যক্তি ব্যাঘ্রের ন্যায় রম্‌জান ও তাহার সঙ্গীকে আক্রমণ করিল। চকিতের মধ্যে তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, তাহাদের মুখে তাহাদের নিজের রুমাল গুঁজিয়া দিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিল। তাহার পর রমণী ও সেই দুই ব্যক্তি বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

অপর দুই সিপাহী রম্‌জান ও তাহার সঙ্গীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ

খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, জলের ধারে হাত-পা-বাঁধা রমজান ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, আর কেহ কোথাও নাই। তাহাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া সকল কথা শুনিতে পাইল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া চার সিপাহী দুর্গের অভিমুখে ফিরিল। মনসবদার শুনিয়া কি বলিবেন এই ভয়ে তাহারা অস্থির হইল।

বলা বাহুল্য, মনসবদার শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রমজান ও অপর তিন জনকে শাস্তি দিলে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এ কথাও তাঁহার মনে হইল। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দুর্গের সিংহদ্বারে নগ্‌গারায় শব্দ হইল। বিস্মিত হইয়া মনসবদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগ্‌গারা বাজিল কেন? কে আসিয়াছে?"

ব্যস্ত হইয়া দ্বাররক্ষক প্রবেশ করিল। কহিল, "খোদাবন্দ, সুবেদার সাহেব রক্ষিবর্গে বেষ্টিত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এখনি এখানে আসিয়া উপনীত হইবেন।"

মনসবদার কহিলেন, "আমি ত কোন সংবাদ পাই নাই।"

তিনি গৃহের বাহিরে গমন করিলেন।

রমজান ও তাহার তিন সঙ্গীর শাস্তির হুকুম মুলতবি রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাদশাহ্-গৃহে—সদরে ও অন্দরে

আলম্‌গীর বাদশাহ রোগশয্যায়। পীড়া কঠিন, হকিমেরা ভয় পাইয়াছে। কিন্তু বাদশাহের মাথা পরিষ্কার, মনের বল অসীম। তাঁহার আদেশে তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ প্রচার হয় নাই। প্রকাশ এই মাত্র যে, বাদশাহ অসুস্থ এবং চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে দিন-কয়েক দর্‌বারে আসিবেন না। আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

পীড়িত অবস্থাতেও বাদশাহ্ সকল সংবাদ রাখিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রধান উজীর ও কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা শুনাইতেন। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়া বাদশাহ্ সকল কথা শুনিতেন ও নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। চিকিৎসকের নিষেধ শুনিতেন না।

বাদশাহের দুই পুত্র—শাহজাদা হাতিম ও শাহজাদা রুস্তম রাজধানীতে ছিলেন না। হাতিম দাক্ষিণাত্যে, রুস্তম বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই দর্‌বার হইতে বাদশাহের পীড়ার কোন সংবাদ পান নাই, কিন্তু রাজধানীতে উভয়ের গুপ্তচর ছিল ও সেই বিশ্বস্তসূত্রে তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন যে, বাদশাহের পীড়া সাংঘাতিক এবং আশু আশঙ্কা না থাকিলেও আরোগ্য লাভ করা কঠিন। দুই ভ্রাতাই যথাসাধ্য সত্বর রাজধানীতে ফিরিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বাদশাহের বিনা অনুমতিতে এবং তাঁহাকে না জানাইয়া ফিরিতেও পারেন না। ষড়যন্ত্র উভয়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং দুই জনেই প্রাণপণে নিজের নিজের দল পুষ্টি করিতেছিলেন।

রুস্তমের অধীনে বুন্দেলখণ্ডে অনেক সৈন্য এবং সেনাপতিত্বে তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য অধিক সংখ্যক সৈন্যই তাঁহার পক্ষে; যাহাতে সমস্ত ফৌজ তাঁহার দিকে হয় তিনি সেই চেষ্টায় ছিলেন।

গুপ্তচর চারিদিকে; রুস্তম কি করিতেছেন সে খবর হাতিমের নিকট পঁহুছিত, আবার হাতিমের সমস্ত কথাই রুস্তম বিদিত হইতেন। বাদশাহের ব্যবস্থা আরও পাকা। তাঁহার গুপ্তচরেরা শুধু শাহজাদাদের নয়, সমস্ত দেশের গুহ্য সংবাদ আনিত। পুত্রদ্বয়ের জন্য বাদশাহ বিশেষ চিন্তা করিতেন না, কারণ রুস্তম জ্যেষ্ঠ না হইলেও হাতিমের অপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অতএব সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত বাদশাহের বিশ্বাস যে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন নহে। কিন্তু আর-এক সংবাদে বাদশাহ বিচলিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের কোন্ অংশে কোন্ স্থানে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই—এক দল ষড়যন্ত্রকারীর বাস। তাহারা সংখ্যায় কয় জন, কখন্ কোথায় থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, চরেরা তাহা সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের যে অত্যন্ত ক্ষমতা ও অসীম উদ্যম তাহাতে কোন সংশয় নাই। সকল দেশে, সকল লোকের মধ্যেই তাহাদের প্রভাব। তাহার নিদর্শন সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের বিস্তার। রাজকর্ম্মচারীদের প্রভুত্ব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সময়ে সময়ে কোন কোন রাজকর্ম্মচারী নিগৃহীত হইয়াছে, এরূপও সংবাদ পাওয়া যায়। রাজকর্ম্মচারীদিগের শাস্তিবিধান বাদশাহের কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ রাজপুরুষের কর্ত্তব্য, অপরে ইহাতে হস্তক্ষেপ করে কেন? যাহাদের এত সাহস, তাহারা ত রাজ্যের প্রতিও লোভ করিতে পারে। ইহার সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্য প্রধান রাজপুরুষগণ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, শাহজাদারাও এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজকর্ম্ম অথবা বাদশাহী কর্ম্মের কিছুই অন্দর মহল হইতে গোপন করা যায় না। অষ্টপ্রহর চারিদিকে প্রহরী, অন্দর মহলের দরজায় দরজায় খোজার পাহারা, পুরুষের সাধ্য কি, মহলের ত্রিসীমায় যায়, জেনানার বেগমেরা—এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত অসূর্য্যম্পশ্যা, তথাপি সকল কথাই অন্তঃপুরে যায়, এবং অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকল কথা লইয়া আন্দোলন করেন। এমন কি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-শালিনী মহিলারা যদি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে অনেক সময় সেই পক্ষের জয় হয়।

যে-সকল কথার উল্লেখ হইল, ইহার কিছুই বাদশাহের অন্তঃপুরে অবিদিত ছিল না। বেগমদিগের মধ্যে প্রধান সিরাজী বেগম, প্রৌঢ়া সুন্দরী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। বেগম ইরাণী, সঙ্গে সেই দেশের দাসী ফিরোজা। যেমন বিবি তেমনি বাঁদী, ফিরোজা চতুর গুপ্তচরকে হাটে বেচিয়া আসিতে পারে।

সিরাজী বেগম নিঃসন্তান। রুস্তমের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল; হাতিমের মাতা রুগ্ন, বুদ্ধিও তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তিনি নিজের রোগ লইয়া ব্যস্ত, অন্য কোন কথাতে থাকিতেন না।

সিরাজী জানিতেন, বাদশাহের রোগ কঠিন, রক্ষা পাইবেন না। তিনি প্রকাশ্যে কোন শাহ্জাদার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, দুই ভাইকেই মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে তুষ্ট রাখিতেন। বেগমের এখন অসীম ক্ষমতা, কিন্তু বাদশাহের অবর্ত্তমানে কি হইবে? ফিরোজা তাঁহাকে পরামর্শ দিত এরূপে দুই নৌকায় পা দিয়া অধিক দিন চলিবে না, এক পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, নহিলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। বাদশাহ আর কত দিন আছেন? রুস্তম চতুর এবং সৈন্যমহলে তাঁহার প্রতিপত্তি অধিক, সুতরাং তাঁহার সহিত যোগ দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। সিরাজী তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

খোজাদিগের নিকট ও তাহাদিগের দ্বারা রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে ফিরোজা সকল সংবাদ রাখিত ও বেগমকে শুনাইত। উজীর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্ম্মচারীই বেগমকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উৎসুক, কারণ, সকলেই জানিত, ইরাণী বেগম সর্ব্বেসর্ব্বা, বাদশাহ তাঁহার মুঠার মধ্যে। ফিরোজা সংবাদ আনিল, রুস্তম ও হাতিম উভয়ে আপন আপন দল পুষ্ট করিতেছেন এবং দুইজনেই রাজধানীতে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আর এই যে নূতন ষড়যন্ত্রকারীর দল, ইহার সংবাদও বেগম পাইলেন।

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে? ইহারা কি চায়? ইহাদের ভিতর কোন নামজাদা লোক, কোন ক্ষমতাবান লোক আছে?"

ফিরোজা বলিল, "এ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু প্রজারা যে দিন দিন ইহাদের বশীভূত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাদশাহ চিন্তিত হইয়াছেন ও ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন। সকল দেশে গুপ্তচরেরা ইহাদের সন্ধান লইতেছে।"

বেগম বলিলেন, "ইহারা কি বাদশাহ হইতে চায়?"

ফিরোজা কহিল, "কেমন করিয়া বলিব, বেগম সাহেবা? যদি ইহাদের পল্টন লস্কর থাকিত, কোন সুবা আক্রমণ করিত, অথবা কোন শহর দখল করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম ইহারা রাজ্যে লোভ করে, কিন্তু সে-সব ত কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। গোপনে ইহারা প্রজাদের কানে কি মন্ত্র জপাইতেছে আর প্রজাদের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। ফৌজ্‌দার তহশীলদারকে আগের মত ভয় ও সম্মান করে না। ষড়যন্ত্রকারীর কোন লোক কখন বা অপর লোককে সঙ্গে করিয়া

কোন রাজপুরুষের অপমান করে, তাহার পর অনেক খুঁজিয়াও তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাহারও বিচার করে, কাহাকেও শাস্তি দেয়। এ কি বাদশাহের উপর বাদশাহী, না পাগলের কাজ? ইহার ভিতরে যে কোন গূঢ় ব্যাপার আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ব্যাপার কি, এ পর্য্যন্ত বাদশাহ্ তাহা কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই।"

বেগম বলিলেন, "আমার কি কর্ত্তব্য?"

"আপাততঃ কিছুই নয়। যখন কিছু জানিতে পারিবেন সেই সময় স্থির করিবেন।"

অন্তঃপুরে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এদিকে শাহ্জাদা রুস্তম বাদশাহ্কে লিখিলেন, "বুন্দেলখণ্ডে আর বিদ্রোহী নাই। বিদ্রোহের নেতারা শূলে গিয়াছে। অনুমতি হয় ত এখন রাজধানীতে ফিরিয়া যাই।"

জবাব আসিল, "নূতন ষড়যন্ত্রের মূল স্থান পূর্ব্ব দেশে, বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ আসিয়াছে। তোমার আদেশ মত কার্য্য করিবার জন্য সুবেদারকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে, দরিয়ার তীরে ও পাহাড়ের নীচে পর্‌গণা ভাল করিয়া দেখিবে। নূরপুরের মন্‌সব্‌দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তদারক করিয়া সুবেদারকে ও হুজুর বরাবর জানাইবে।"

শাহ্জাদা হাতিম বাদশাহ্কে লিখিলেন, "আমার শরীর অসুস্থ, এখানে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। আমাকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি হউক।"

বাদশাহ্ উত্তর দিলেন, "বাসীনে সমুদ্রতীরে উত্তম বাদশাহী বারাদরী আছে। সম্প্রতি সেইখানে গিয়া বাস করিবে।"

রুস্তম ও হাতিম দুইজনই বুঝিলেন যে, বাদশাহের পীড়া যেমনই হউক, তাঁহার মস্তিষ্কের ও বুদ্ধির কিছুমাত্র বিকার বা হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে বাদশাহের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। পুত্রদ্বয়ের অপেক্ষা পিতা অনেক চতুর এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসনে অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বাদশাহের আদেশ দুই জনকেই পালন করিতে হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কুম্ভমেলা

মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কুম্ভমেলা। গঙ্গার উভয় তীর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, যাত্রী এবং কল্পবাসীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যমুনার তীরে যাত্রী-সংখ্যা অল্প। গঙ্গার বালুতটে ও চরে লোকের সংখ্যা হয় না। পূর্ব্ব তটে দুই তিন ক্রোশ দূরে ঝুঁসী পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। পশ্চিম তটে রামঘাট হইতে দারাগঞ্জ ও তাহার সম্মুখের মাঠে বিপুল লোক-সমাগম। কল্পবাসীরা সেই দুরন্ত শীতে একমাত্র কম্বল লইয়া কুটীয়ায় রাত্রি যাপন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক বিস্তর। উদাসী সাধু সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালাইয়া নগ্নদেহে, একমাত্র কৌপীন ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। কেহ এক মাসের পথ, কেহ ছয়মাসের পথ পদব্রজে আসিয়াছে। স্থানে স্থানে নাগা সন্ন্যাসীর দল। তাহারা দিগম্বর, সকল সন্ন্যাসিদলের অগ্রণী।

জনতা হইতে দূরে, বালুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে কয়েকজন মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। মেলার ভিতর তাঁহা-দিগকে কেহ দেখিতে পাইত না, কুটীরের বাহিরে তাঁহারা বড় একটা যাইতেন না। কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইত এবং অতি গভীর জ্ঞানের আলোচনা হইত। একত্র তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হইত না যে, দ্বাদশ-বর্ষে তাঁহাদের একবার মাত্র সাক্ষাতের সুযোগ হয়। বর্ত্তমান-কালে বিজ্ঞান-বলে যেমন বিনাতারে বৈদ্যুতিক সংবাদ বহু দূর প্রেরণ করা যায়, সেইরূপ যোগী জ্ঞানীদিগের মানসিক অথবা

যোগের ক্ষমতা আছে যদ্দারা তাঁহাদের পরস্পর জ্ঞান-বন্ধন থাকে, স্থান-ব্যবধানে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় না।

এই কুম্ভমেলায় কয়েক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। ইঁহারা সেই পূর্ব্বপরিচিত গিরিগুহার মন্ত্রণাকারিগণ। যাঁহাকে পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং যিনি এই কয়জনের নেতা, তিনিও আছেন। ইঁহারা যাত্রীদিগের ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কোথায় কি কথোপকথন হইতেছে শুনিতেছেন, অবসর বুঝিয়া নিজেরাও কিছু বলিতেছেন। তাঁহাদের কথায় শ্রোতারা প্রথমে বিস্মিত হইতেছে, তাহার পর মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছে, অবশেষে চিন্তামগ্ন হইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই অতিথি মেলার স্থান হইতে অনেক দূরে একটি কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরে যিনি বসিয়া ছিলেন তাঁহার সন্ন্যাসীর ঠাট কিছুই ছিল না। জটাজূট ভস্ম-তিলক ধুনি কিছু ছিল না। তিনি যে গৃহস্থ নহেন, তাহার একমাত্র নিদর্শন গৈরিক বাস। ললাটের সে প্রশস্ততা, মুখের প্রশান্ততা এবং দৃষ্টির প্রগাঢ়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি মহাপুরুষ, বিক্ষিপ্তচিত্ত বিষয়াসক্ত গৃহস্থ নহেন।

পথিক ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদের ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গৌরীশঙ্কর, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা হইতেছে?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এ কথার কেমন করিয়া উত্তর দিব? উদ্যম ও পুরুষকার আমাদের, যিনি সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধি তাঁহার অধীন। কিন্তু আপনি ত আমাকে কোন আদেশ করেন নাই, আমাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। প্রজার

মঙ্গল ব্যতীত আমাদের অপর স্বার্থ নাই, কিন্তু কোনরূপ আপনার ইঙ্গিত পাইলে যেরূপ বিশ্বাস ও বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি, শুধু আত্মনির্ভর হইয়া সেরূপ পারি না। সেই কারণে এমন মহাতীর্থ স্থানেও আপনার সমক্ষে আসিতে সাহসী হইয়াছি।"

কুটীরবাসী ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভাত হইল। পরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট কথায় কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ অনুযোগ করিতে পার। আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিছু স্থির করিতে পারি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে রজোগুণের প্রাধান্য, সেস্থানে আমরা কি করিতে পারি? মূলে চিন্তা থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যতৎপরতাই এ কার্য্যের প্রধান সহায়। তোমার স্বভাব রজোগুণপ্রবল, কর্ম্মে তোমার ক্লান্তি নাই; কিন্তু আমি ত কর্ম্মী নহি; এই কারণে তোমার সহায় হইতে পারিতেছি না, তোমাকে উপযুক্ত পরামর্শও দিতে পারিতেছি না। তবে মানবের প্রকৃতি জানি, এবং সেই অনুসারে বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তোমার কর্ম্মে বিঘ্নবাধা বিস্তর। যে কোন কর্ম্ম করে তাহাতে অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলেই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই কর্ম্মফলে লুব্ধ। রাজকর্ম্মের তুল্য প্রলোভনের কার্য্য আর নাই। যদি সে কর্ম্মে, যে-কোন কারণেই হউক, তুমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর, তাহা হইলেই স্বতঃ প্রমাণিত হইবে যে, তুমি রাজ্যলুব্ধ, অথবা রাজ্যের অংশ চাও, সেই অভিপ্রায়ে প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করিবার প্রয়াস করিতেছ; তুমি যে নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। রাজপুরুষেরা ত তোমাকে ধরিতে পারিলে বিনা বিচারে তোমাকে হত্যা করিবে, তোমাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ দিবে না। তোমার মৃত্যু-ভয় নাই জানি, কিন্তু তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি না বিবেচনাস্থল।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বাদশাহের আদেশে গুপ্তচর আমাদের পিছনে লাগিয়াছে। যদি বাদশাহ্ বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কারণ প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজার হিতসাধন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণ হিসাবে রাজারও হিতসাধন হইবে। কিন্তু আপনি যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন, ঘটিয়াছেও তাহাই, কেননা বাদশাহ আমাদিগকে ষড়যন্ত্রকারী ও রাজবিদ্রোহী স্থির করিয়াছেন এবং ধৃত হইলেই আমরা ঘাতকের হস্তে সমর্পিত হইব। সেজন্য আমাদের কিছুমাত্র চিন্তা নাই এবং আমাদের কার্য্য বন্ধ হইবে না। কিন্তু আমাদের কাল পূর্ণ হইয়া থাকিলেও মৃত্যুর পূর্ব্বে কার্য্যের কোন ফল হইল কি না জানিতে ইচ্ছা করে।"

"প্রজাদের মনের অবস্থা কিরূপ ?"

"রাজকর্ম্মচারীদিগের পীড়নে তাহারা উপদ্রুত হইয়াছে, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু বাদশাহের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহে না। আমরা জানি বাদশাহ সমদর্শী, রাজপুরুষদিগের প্রতি কঠিন আদেশ আছে যে, ধর্ম্ম অথবা জাতিভেদে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করিবে না, এবং কদাচ কোনরূপ উৎপীড়ন করিবে না। তাঁহার পীড়া কঠিন, তথাপি তিনি রাজকর্ম্ম স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং সকলকে শাসন করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহারই কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু সে কথা তাঁহাকে বুঝাইবে কে ? তাঁহার ধারণা, আমাদের ঘোর দুরভিসন্ধি আছে এবং আমরা রাজ্যনাশের চেষ্টা করিতেছি।"

"এতদ্ভিন্ন অন্য বিশ্বাস তাঁহার মনে হইতেই পারে না। তুমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর না কেন ?"

"সে ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে আমি এমন পরামর্শ দিতাম না। বাদশাহকে আমি সংবাদ দিব। তাঁহার অভয় পাইলে তুমি যাইবে, তবে সন্ন্যাসীর বেশে যাইও না, রাজদর্শনে যেরূপ বেশে যাওয়া উচিত, সেইরূপ যাইবে, যাহাতে কর্ম্মচারী ও পার্শ্বচরেরা সন্দিগ্ধ না হয়।"

"যেরূপ আজ্ঞা" বলিয়া, প্রণাম করিয়া গৌরীশঙ্কর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস কুম্ভযোগের স্নান। সে দৃশ্য একবার দেখিলে জীবনে ভুলিবার নহে। প্রাসাদ নাই, গৃহ নাই, অথচ বালুকাসৈকতে মহানগরীর তুল্য লোকনিবাস, লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গমে স্নান করিবে। সর্ব্বপ্রথমে নাগা সন্ন্যাসী, দুই দুই জন করিয়া সারি দিয়া চলিয়াছেন। অপর স্নানকারীরা দুই ধারে দাঁড়াইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছে। তাঁহাদের শুধু স্পর্শ-স্নান, তাঁহারা অবগাহন করেন না। তাঁহাদের পর আর-এক দল সন্ন্যাসী, তাহার পর আবার এক দল, শ্রেণীর পর শ্রেণী, কাতারের পর কাতার। সন্ন্যাসীদিগের পর গৃহস্থ, পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র স্থানে স্নান করিতে চলিল। সে জনস্রোত প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ফুরায় না। সকলের মুখে একাগ্রতা ও তন্ময়তা। কাহারও কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কোন লক্ষ্য নাই, কেবল কলকল্লোলপূর্ণ সিতাসিত-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে।

গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গিগণ দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যদি এই একাগ্রতা, এই তন্ময়তা, কোন মহাপুরুষ আর-এক খাদে প্রবাহিত করিতে পারিতেন।"

দশম পরিচ্ছেদ

শাহ্জাদার আগমন

মন্সব্দার জলালুদ্দীন গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সুবেদার নসরুল্লা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেছেন। মন্সব্দার সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "হুজুরের আগমনের আমি কোন সংবাদ পাই নাই। এজন্য আপনাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে যাইতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।"

সুবেদার কহিলেন, "সংবাদ দিবার অবসর হয় নাই। পশ্চাতে শাহ্জাদা রুস্তম আসিতেছেন, তিনি কল্য এখানে আসিয়া পঁহুছিবেন।"

মন্সব্দার আকাশ হইতে পড়িলেন। "শাহ্জাদা ত বুন্দেলখণ্ডে, এ অঞ্চলে আসিবার ত কোন কথা প্রকাশ পায় নাই।"

"তিনি বাদশাহের আদেশে দ্রুত কুচ করিয়া আসিতেছেন, সঙ্গে সৈন্য অল্প। কয়েকটি গোপনীয় বিষয়ের তদারকের ভার তাঁহার উপর। তিনি কোথায় যাইতেছেন ফৌজে কেহ জানে না। কার্য্য সমাধা করিয়া আবার সত্বর ফিরিয়া যাইবেন।"

মন্সব্দার চিন্তিত হইলেন। গোপনীয় বিষয় কি রকম? তাঁহার সংক্রান্ত কোন কথা আছে? সুবেদারকে স্পষ্ট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, বলিলেন, "আমার প্রতি কোন আদেশ আছে?"

সুবেদার কহিলেন, "শাহ্জাদা আসিলে জানিতে পারিবেন।"

আহারাদির পর সুবেদার আরাম করিয়া বিদ্রির গুড়্গুড়িতে উত্তম খামিরা তামাকু সেবন করিতেছিলেন। মন্সব্দার উপস্থিত

ছিলেন। সুবেদার বলিলেন, "আমার পূর্ব্বে যে সুবেদার ছিলেন তিনি আপনার কর্ম্মে সন্তুষ্ট ছিলেন।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "আমি আপনাদের তাঁবেদার, আপনাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

সুবেদার কহিলেন, "আমাকে সন্তুষ্ট করিবার ত কোন চেষ্টা করেন নাই ?"

"আপনি সম্প্রতি আসিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সুযোগ হয় নাই। এখন যেমন আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত।"

চক্ষে চক্ষে সুবেদার ও মন্‌সব্‌দারে একটা কথা হইয়া গেল।

সুবেদার কহিলেন, "গোপনীয় বিষয়ের কথা কহিতেছিলাম। তাহাতে আপনিও লিপ্ত আছেন। বাদশাহের নিকট আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।"

মন্‌সব্‌দারের মুখ শুকাইল। কহিলেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ? এ কোন্ দুশ্‌মনের কাজ ?"

সুবেদার কয়েকটা গ্রামের নাম করিলেন। কহিলেন, "প্রজা-পীড়নের ও পক্ষপাতিতার অভিযোগ।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "আমার জান-মান-ইজ্জত আপনার হাতে। আপনি না রক্ষা করিলে শত্রুতে আমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

সুবেদার কহিলেন, "তোমার সহায়তা করিব বলিয়াই তোমাকে আগে হইতে জানাইতেছি। শাহজাদার তদারকে যাহাতে কিছু প্রকাশ না পায় সে চেষ্টা তোমার হাত।"

মন্‌সব্‌দার সেই রাত্রেই সুবেদারকে সন্তুষ্ট করিলেন।

শাহজাদা আসিয়া তদারক করিলেন। মন্‌সব্‌দারের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "জাঁহাপনা,

রাজপুরুষদিগকে অনেক রকম কর্ম্ম করিতে হয়, অনেক লোককে শাসন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু অভিযোগ প্রায় অমূলক।"

রুস্তম কহিলেন, "তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু আর-একটা বিষয় কিছু গুরুতর। মন্‌সব্‌দার সাহেব, আপনি এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন?"

মন্‌সব্‌দার যুক্তকরে কহিলেন, "খোদাবন্দ, এই ইলাকায় ত কোন ষড়যন্ত্রকারী নাই।"

হাস্য করিয়া শাহজাদা কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি সবিশেষ সংবাদ রাখেন না। ষড়যন্ত্রকারীদিগের কি অভিপ্রায়, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহারা বিদ্রোহের সূত্রপাত করিতেছে। বাদশাহ সমস্ত দেশের সম্রাট্; রাজপুরুষগণ তাঁহার অধীনে, তাঁহার আদেশ-মত রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। প্রজার যাহা অভাব বা যে অভিযোগ তাহা রাজপুরুষদিগকে জানাইবে। অপর কোন ব্যক্তির কি ক্ষমতা যে, প্রজাদিগকে কোন মন্ত্রণা দেয় অথবা রাজপুরুষদিগের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে? পথে আসিতে আমি বিশ্বস্ত সংবাদ পাইয়াছি যে, এই-সকল ষড়যন্ত্রকারিগণ প্রজাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়, রাজপুরুষদিগের কর্ম্মে বাধা দিবার চেষ্টা করে। আপনি এই মহকুমার মন্‌সব্‌দার, আপনি কোন সংবাদ রাখেন না?"

মন্‌সব্‌দার বিনীতস্বরে কহিলেন, "গরিব্‌পর্‌ওয়র, এ-রকম কোন ঘটনা গোলামের ইলাকায় হয় নাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম।"

শাহজাদা বলিলেন, "তাহা না হইলেও এই অঞ্চলে কোনখানে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মন্ত্রণার স্থান আছে শাহান্‌শাহ্ স্বয়ং পাকা সংবাদ

পাইয়াছেন। আপনি কিছু জানেন না ইহা প্রশংসার কথা নহে।”

মন্‌সব্‌দার অধোবদন হইলেন। অনুনয়পূর্ব্বক কহিলেন, “যদি হুকুম হয় তাহা হইলে আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া হুজুরে জানাইব।”

শাহজাদা কহিলেন, “আমি এক সপ্তাহ থাকিব, আপনি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারেন আমাকে জানাইবেন।”

মন্‌সব্‌দার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক লইয়া সমস্ত মহকুমায় তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। প্রজাদের মনোভাবে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং কয়েক ব্যক্তি সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করে ও প্রজাদিগকে কিছু পরামর্শ দেয়, জানিতে পারা গেল ; কিন্তু ষড়যন্ত্র, অথবা বিদ্রোহ অথবা মন্ত্রণার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। শাহজাদা আশ্বস্ত হইয়া রাজধানীতে সেইরূপ সংবাদ পাঠাইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকের অন্বেষণ

মনসব্দারের আদেশ অনুসারে যখন রমজান ও আর তিনজন লোক বনবাসিনী রমণীকে ধরিয়া আনিতে যায়, সেই সময় একজন সাক্ষী ছিল। বিহারীলালের গৃহে বা সংসারে পুণ্ডরীকের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল না। যখন যেখানে ইচ্ছা সে ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাক্রমে সেদিন বনে যাইবার পথে একটা অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় দেখিল, কেল্লা হইতে মনসব্দারের একজন লোক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই পুণ্ডরীক গাছের আড়ালে লুকাইল। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিল, একজনের পিছনে আর-একজন আসিতেছে, তাহার পিছনে আর-একজন, আরও পিছনে আর-একজন, এইরূপে চার জন জুটিল। পুণ্ডরীক সিদ্ধান্ত করিল, ইহাদের কিছু মৎলব আছে। সে নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে তাহাদের সঙ্গ লইল।

পুণ্ডরীক যখন বুঝিল, যে সেই কয়েক ব্যক্তি বনবাসিনী রমণীর সন্ধানে যাইতেছে, তখন পুণ্ডরীক পূর্ব্বের মত গাছে উঠিল। যাহা যাহা ঘটিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দেখিল। আপনার মনে নিঃশব্দে হাসিল। পরাহত বীরেরা পলায়ন করিলে পুণ্ডরীক বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাবধানে যেস্থানে রমণী দাঁড়াইয়াছিল সেই দিকে গমন করিল। পল্বলের পাশে উপনীত হইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন সে অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

শিকারে প্রচ্ছন্ন বা লুক্কায়িত জন্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে পুণ্ডরীক অদ্বিতীয়। তাহার সে ক্ষুদ্র চক্ষে অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। বনের মধ্যে গৃহ নাই, কোথাও বাসস্থান নাই, তবে রমণী কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়? সে দেবী নয়, মায়াবিনী রাক্ষসী নয়, সাধারণ মানবী। অলোকসামান্য সুন্দরী কিন্তু মানবী বই আর কিছু নয়। বনের ভিতর, সম্ভবতঃ নিকটেই, অপরের অলক্ষিত এমন কোন স্থান আছে যেখানে লুকাইলে কেহ দেখিতে পায় না। সেই স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—বিহারীলাল যে-কারণে রমণীকে আবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সে কারণে নহে, মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দিনের ইন্দ্রিয়লালসা পুণ্ডরীকের স্বপ্নের অগোচর। তাহার কেবল উদ্দেশ্যশূন্য কৌতূহল। লুকাচুরি খেলায় যেমন অপর বালকেরা লুক্কায়িত বালককে খুঁজিয়া বাহির করে, ইহাও সেইরূপ। রমণী কোথায় লুকায়, কোথায় অদৃশ্য হয়, কেহ খুঁজিয়া পায় না। এ রকম লুকাচুরিতে পুণ্ডরীক সকলের অপেক্ষা মজ্‌বুত, অতএব সে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

সে সময় পুণ্ডরীক আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। দৃষ্টি চারিদিকে, বৃক্ষপত্রের পতন-শব্দ পর্য্যন্ত তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পদশব্দ আদৌ শুনিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের আড়ালে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে সে ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়, এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধশুষ্ক বটবৃক্ষ, তাহার নীচে, এক পার্শ্বে স্তূপাকার পত্ররাশি। এমন স্থানে এরূপ করিয়া পত্র সংগ্রহ করা—হয় কোন জন্তুর কিম্বা কোন মানুষের কাজ, আপনা-আপনি এত পত্র জড় হইতে পারে না। পুণ্ডরীক বৃক্ষমূলে গিয়া, মাটীতে বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, আশে-পাশে তৃণ সদ্য-পদদলিত, চিহ্নে মানুষের পদ অনুমান

হয়। তখন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পুণ্ডরীক সেই পত্ররাশি সরাইতে আরম্ভ করিল। পত্রস্তূপের নীচে দেখিল একটা বৃহৎ গহ্বর, গহ্বরে নামিবার সিঁড়ি। পুণ্ডরীক নির্ভয়ে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

কয়েকটা ধাপ নামিয়া গিয়া অন্ধকার। তাহার পর কতকটা সমভূমি। পুণ্ডরীক অনুমান করিল সোপান শেষ হয় নাই, আগে আরও সিঁড়ি আছে। সে সাবধানে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

সহসা সেই অন্ধকারে কে পুণ্ডরীকের গলা টিপিয়া ধরিল। যে ধরিল সে সাতিশয় বলবান্। কিন্তু পুণ্ডরীক রম্‌জান ও তাহার সঙ্গীগণের ন্যায় সহজে ধৃত অথবা পরাস্ত হইবার নহে। বলে সে প্রায় বিহারীলালের তুল্য, ক্ষিপ্রহস্ততায় তাঁহার অপেক্ষা কুশলী। সে নিমেষের মধ্যে মুক্ত হইয়া আক্রমণকারীকে লৌহদণ্ডতুল্য বাহুযুগলে ধারণ করিয়া, শিশুর ন্যায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া দুই লম্ফে গহ্বরের বাহিরে আসিল। তাহার পর তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া জানু দিয়া চাপিয়া ধরিল।

এ পর্য্যন্ত দুই জনের কেহ একটা কথাও কহে নাই, যাহা ঘটিল তাহা নিঃশব্দে, নীরবে।

পুণ্ডরীক দেখিল—যে-ব্যক্তিকে সে ধরাশায়ী করিয়াছিল সে কোন অপর দেশবাসী, বেশ অন্য রকম, মুখশ্রী অন্য রকম, বলিষ্ঠ প্রৌঢ় পুরুষ; সে পুণ্ডরীককে দেখিতেছিল।

এই অবসরে আর দুই জন আসিয়া পুণ্ডরীককে আক্রমণ করিল। দুই জনে তাহার দুই হস্ত ধারণ করিল। তাহাদের কি সাধ্য পুণ্ডরীককে ধরিয়া রাখে? তাহার বাহু-তাড়নায় দুই জন দুই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীক লাফাইয়া উঠিয়া, কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া,

অসি হস্তে দাঁড়াইল। তখন সেই কুৎসিত ক্ষুদ্রকায় মূর্ত্তি বীরত্বের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, সে ক্ষুদ্র চক্ষে বিদ্যুৎ বিলসিত হইল, সেই বৃহৎ মস্তক সদর্পে সিংহের ন্যায় উন্নীত হইল, কবাটবক্ষ স্ফীত হইল, বাহুর মাংসপেশী লৌহের ন্যায় কঠিন হইল; সিংহবিক্রমে, হাস্যমুখে পুণ্ডরীক আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে ব্যক্তি ভূতলে পতিত ছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিন জনেই অসি নিষ্কাশিত করিয়া একত্রে পুণ্ডরীককে আক্রমণ করিল। বিচিত্র অসিচালনা করিয়া পুণ্ডরীক ক্ষণেকের মধ্যে তিন জনকেই নিরস্ত্র করিল কিন্তু তাহাদিগকে স্বয়ং আক্রমণ করিল না। তাহার মুখে হাসি লাগিয়া ছিল। পুণ্ডরীক কহিল, "তিন জনের কর্ম্ম নয়, তোমাদের দলে আরও যদি লোক থাকে ত তাহাদিগকে ডাক। আমি মন্‌সব্‌দারের পশ্চাদ্গামী শৃগাল নহি।"

"তবে তুমি কাহার অগ্রগামী সিংহ?" অমৃতময় মধুর কণ্ঠে, পুণ্ডরীকের পশ্চাৎ হইতে কে এই কথা বলিল। পুণ্ডরীক ফিরিয়া দেখিল, বনবিহারিণী সেই মোহিনী মূর্ত্তি!

অসি নত করিয়া, অবনত মস্তকে পুণ্ডরীক অভিবাদন করিল। বিনীত স্বরে কহিল, "আমি চৌধুরী বিহারীলালের সামান্য ভৃত্য।"

সবিস্ময়ে, বিস্ফারিত চক্ষে রমণী কহিল, "যাহার ভৃত্য এমন, সে প্রভু কেমন?"

তখন পুণ্ডরীক সগর্ব্বে উত্তর দিল, "আমার প্রভুর তুল্য বীর ভারতে নাই।"

"ইহা অতি দর্পের কথা!"

"সত্য কথায় দর্প নাই। যে-কেহ অথবা যে-কয়জন আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে, তাহার অথবা তাহাদের সহিত বিহারীলালের

যুদ্ধ-পরীক্ষা হউক। মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, ধনুর্ব্বাণ-যুদ্ধ, এক প্রকার অথবা সকল প্রকার পরীক্ষা হউক, তাহা হইলেই আমার কথা অথবা আমার দর্প সত্য প্রমাণ হইবে।”

রমণী কহিল, “সে কথা যাক্। তোমাকে কি তোমার প্রভু এখানে পাঠাইয়াছেন?”

“আমি যে এখানে আসিয়াছি তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাঁহার অজ্ঞাতে আসিয়াছি।”

“তিনি যদি তোমাকে আদেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?”

পুণ্ডরীক যে বীর, তাহা সকলেই জানিত, কিন্তু সে যে বক্তা, তাহা কেহ জানিত না। এই রমণীর সাক্ষাতে সে সর্ব্বপ্রথম বীর ও বক্তা উভয়রূপে প্রকটিত হইল। কিন্তু এখন তাহার বক্তৃতা-শক্তি লুপ্ত হইল। মুখের দীপ্তি, চক্ষের জ্যোতি তিরোহিত হইল। পুণ্ডরীক নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া মাথা চুল্কাইতে লাগিল। অবশেষে এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, “আমার কোন উদ্দেশ্য নাই, অমনি আসিয়াছিলাম।”

রমণী হাসিল, বলিল। “তাহা হইলে এই গহ্বর খুঁজিয়া কেমন করিয়া বাহির করিলে? আর ইহাতে প্রবেশ করিবারই তোমার কি প্রয়োজন?”

পুণ্ডরীক মুস্কিলে পড়িল। বলিল, “আপনি কোথায় থাকেন তাহাই খুঁজিতেছিলাম।”

“কেন? আমি কোথায় থাকি তোমার জানিবার আবশ্যক কি? আর ব্যাঘ্র-শৃগালের মত গহ্বরে বাস করি, তাহাই বা কেমন করিয়া স্থির করিলে?”

তিন জনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিবার সময় পুণ্ডরীক হাসিতেছিল, কিন্তু এই রমণীর জেরায় তাহার ললাটে ঘাম দেখা দিল। কহিল, "আজ্ঞা, এখানে ত কোনও ঘরবাড়ী নাই। গহ্বরের বাহিরে মানুষের পদচিহ্ন ছিল। আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।"

রমণী কহিল, "তাহা ত এই যুদ্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। আমি কোথায় থাকি, তাহা ত দেখিলে? গহ্বরের ভিতরে আবার যাইবে? আমার এ বাসস্থানের সংবাদ অবশ্য তোমার প্রভুকে জানাইবে?"

পুণ্ডরীক হস্তের তরবারি রমণীর পদতলে নিক্ষেপ করিল। কহিল, "আপনার অনুচরদিগকে আদেশ করুন, এই অসি দ্বারা আমাকে হত্যা করে, আমি আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিব না। নচেৎ যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আজ আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা চৌধুরী বিহারীলাল অথবা আর কেহ কখন জানিবে না।"

রমণী বলিল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি, তুমি তরবারি উঠাইয়া লও। আর তোমার প্রভুর নিকট কোন কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে বলিবে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, যত শীঘ্র সম্ভব যেন আমার সঙ্গে এই স্থানে দেখা করেন। তুমিও তাঁহার সঙ্গে আসিও, আর যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে মাঝে মাঝে একাও আসিও। আমি তোমার নিকট তরবারি-খেলা শিখিতে চাই।"

পুণ্ডরীক অবাক্।—"তরবারি খেলা? স্ত্রীলোক শিখিবে?"

"ক্ষতি কি!"

পুণ্ডরীক বিদায় হইল। রমণী লজ্জায়-অধোমুখ অনুচরদিগকে কহিল, "তোমরা বীরপুঙ্গব বটে! একটা মর্কটের মত মানুষের কাছে তিন জনেই হারিলে!"

তিন জনে সমস্বরে কহিল, "ওটা কি মানুষ!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হিসাবে ভুল

বেগমদিগের দাসীরাও পর্দানশীন, মহলের বাহিরে যাওয়া কিম্বা কোন ভৃত্য অথবা কর্ম্মচারীর সহিত কথা কহা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু গোপনে অপরাধ করা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই স্বভাব, কেহ শাস্তির ভয়ে নিবৃত্ত হয় না। ফাতেমা বিবির বাঁদী নসরৎ গোপনে রম্‌জানের সহিত সাক্ষাৎ করিত। রম্‌জানের নিকট সংবাদ জানিয়া ফাতেমা বেগমকে বলিত। রম্‌জানকে খুসী রাখিবার জন্য রহস্য-আলাপও করিত। সুবেদার ও শাহ্‌জাদা চলিয়া গেলে এক দিন সন্ধ্যার সময় নসরৎ রম্‌জানের সহিত দেখা করিল।

রম্‌জান বলিল, "আজ কি মতলব?"

নসরৎ কহিল, "মত্‌লব আবার কি? মত্‌লব না থাকিলে কি আসিতে নাই? না হয় উঠিয়া যাই।"

নসরৎ উঠিবার ভাণ করিল। রম্‌জান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সে কি কথা! একটা দিল্‌লগীর কথা কি বলিতে নাই?"

নসরৎ কহিল, "মিঞা, সে পরের কথা। গোড়াতেই কেন?"

রম্‌জান কহিল, "কসুর মাফ!"

নসরৎ বলিল, "এখন ত তোমার কাছে আর কোন খবরই পাওয়া যায় না। বেগম কত রাগ করেন।"

"আমি ত তোমাকে সব খবরই বলি, তবে না থাকিলে কি কাহিনী বানাইয়া বলিব? এমন রাগ বেগমের অন্যায়।"

নসরৎ রম্‌জানের একটু কাছে সরিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সেদিন তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?"

"কবে?" রম্‌জান যেন কিছুই জানে না।

"তুমি আমার কাছে লুকাইতেছ। যেদিন তোমরা কয়জন মিলিয়া সেই বনমানুষীটাকে ধরিতে গিয়াছিলে?"

রম্‌জান তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, মন্‌সব্‌দার সাহেব ও-কথা শুনিলে আমরা জল্লাদের হাতে যাইব।"

"না শুনিলেই কি তোমরা রক্ষা পাইবে না কি?"

রম্‌জান কহিল, "একথা তুমি কাহার মুখে শুনিলে?"

"যাহারই মুখে শুনিয়া থাকি, এখন তোমার মুখে শুনিতে চাই।"

রম্‌জানের বড় ভয় হইল। সে একা নয়, তাহার সঙ্গে আরও তিন জন ছিল। কে প্রকাশ করিয়াছে, কে জানে? আর এখন সে যদি নসরতের নিকট ব্যাপারটা গোপন করে, তাহা হইলে বেগম রাগ করিবেন। যদি মন্‌সব্‌দার জানিতে পারেন, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! রম্‌জান উভয়-সঙ্কটে পড়িল। এমন অবস্থায় সে বুদ্ধির কাজ করিল, সকল কথা নসরৎকে খুলিয়া বলিল।

নসরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "অওরতটা দেখিতে কেমন?"

রম্‌জান চোক উল্টাইয়া বলিল, "কুছ পুছো মৎ! বিহিশ্‌তের হুরী বা কোথায় লাগে। তাহাকে পাইলে মন্‌সব্‌দার আর কোন বেগমের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না।"

"একথা বেগমকে এখনি বলিতে হইবে," বলিয়া নসরৎ উঠিল।

রম্‌জান তাহার পথ আগ্‌লাইয়া বলিল, "বাঃ, এমন খবরের জন্য কিছু ইনাম দিবে না ?"

"তুমি ত বড় বেতমীজ" বলিয়া নসরৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। গিয়া ফাতেমা বেগমকে সকল কথা শুনাইল।

বনবাসিনী রমণী পরমা সুন্দরী শুনিয়া ফাতেমার আশঙ্কা হইল। তিনি মলেকা বেগমের মহলে গমন করিলেন।

ফাতেমা বড়-একটা কাহারও মহলে যাইতেন না। সুয়া কি না, আপন গরবেই থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মলেকা ভাবিলেন একটা-কিছু বড়-ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে, নইলে ইনি যে হঠাৎ এখানে ! মলেকা ফাতেমাকে আদর করিয়া নিজের পাশে বসাইয়া, সোনার-শিকল-দেওয়া পানদানি হইতে কেওড়াজল-দেওয়া পানের খিলি বাহির করিয়া দিলেন। "এস, বহীন, বস", বলিয়া মলেকা ফাতেমার হাত ধরিলেন।

ফাতেমার আদব-কায়দা বিল্‌কুল দুরুস্ত। বলিলেন, "বেগম সাহেবা, আমাদের তিন ভগিনীরই ত ভারি বিপদ।"

মলেকা মনে মনে হিসাব করিলেন, বিপদ এক জনের, যিনি বলিতেছেন, তাঁর। মলেকা কিম্বা খদিজার বিপদের জন্য ফাতেমার ত বড় মাথা-ব্যথা ! এখন তিন জনকে একসঙ্গে জড়াইবার অর্থ আর কিছু নয়, কথার একটু অলঙ্কার—গৌরবে বহুবচন। মলেকা মুখে বলিলেন, "কি রকম বিপদ ?"

"মন্‌সব্‌দার আবার শাদি করিবেন।"

"সে তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ত আরও একটা শাদি করিতে পারেন। তাহাতে আমাদের বিপদ্ কি ?"

"শুনিতেছি সে অওরৎ নাকি বড় খুব্‌সুরত। তাহা হইলে ত মন্‌সব্‌দার আমাদের দিকে আর চাহিয়াও দেখিবেন না।"

মলেকা মুখ বিকৃত করিলেন। "বহীন, তুমি নিজের কথা বল। মন্‌সব্‌দার আমাদের দিকে কবেই বা চাহিয়া দেখেন ?"

ফাতেমা নম্রভাবে কহিলেন, "আমাকে যাহাও বা একটু মেহেরবানি করেন, তাহাও করিবেন না। কিন্তু আমি সে-কথা ভাবিতেছি না। মন্‌সব্‌দার যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন, সে নাকি বনে থাকে, কোন্ দেশে বাস, কেহ জানে না, হয়ত এখানে আসিয়া আমাদের সকলের প্রতি অত্যাচার করিবে। তখন আমাদের কি দশা হইবে ?"

"কি আর হইবে ? নসীবে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমাদের ত আর তাড়াইয়া দিতে পারিবে না, তাহা হইলে মন্‌সব্‌দারের বদ্‌নাম হইবে। আর অত্যাচার করিলে আমরা বাদ্‌শাহকে আরজি করিব।"

এমন সময় খদিজা বেগম আসিলেন। খদিজা সুন্দরী, বয়স অল্প, চতুর, স্বল্পভাষিণী। ফাতেমার কথা শুনিয়া খদিজা কহিলেন, "মন্‌সব্‌-দারের যেমন ইচ্ছা সেইরূপ করিবেন, আমাদের তাহাতে কি ? আমরা যেমন আছি সেইরূপ থাকিব।"

ফাতেমা বুঝিলেন না। তিনি বুদ্ধিমতী হইলে কি হয়, ঈর্ষাদ্বেষে জর্জ্জরিত-হৃদয় হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার পর মন্‌সব্‌দার সাহেব তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি মুখ ভার করিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

জলালুদ্দীনেরও মন ভাল ছিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে যদিও কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার ভয় হইয়াছিল। বাদশাহের নিকট কে নালিশ করিল ? এ ত মুর্খ গ্রামবাসীর কাজ নয়। এ কোন বুদ্ধিমান শক্রর কাজ। আরও একটা কথায় তিনি উদ্বিগ্ন

হইয়াছিলেন। বনবাসিনী কে? সে ত একাকিনী নহে, সঙ্গে রক্ষকগণ আছে, রম্‌জান ও তাহার সঙ্গীর দুর্দ্দশা তাহার প্রমাণ। বনে কোথায় এমন স্থান আছে যেখানে ইহারা লুকাইয়া থাকিতে পারে? আর এত দেশ থাকিতে ইহারা বনেই বা কেন আছে? এই যে ষড়যন্ত্র, ইহার সহিত কি ইহারা লিপ্ত? এই কথা মনে হইতেই মন্‌সব্‌দার আরও শঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ় হইয়াছিল। এই-রকম নানারূপ ভাবনায় তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত ছিলেন, ফাতেমার মহলে বিশ্রাম ও তৃপ্তির জন্য আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন বেগম মানিনী, কথাই কহেন না।

মন্‌সব্‌দার কৌতুকের ক্ষীণ চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "বিবি, গোসা কেন? বন্দার কোন অপরাধ হইয়াছে?"

বেগম কাঁদিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "অপরাধ কাহারও নাই, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

জলালুদ্দীন অবাক্। "কেন, কে কি করিয়াছে, কে কি বলিয়াছে?"

"কে আবার কি করিবে, কি বলিবে? আমি কি আর কাহারও কোন পরোয়া করি? তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া অহঙ্কার করিতাম, সে অহঙ্কার ঘুচিল।"

"ও কি কথা?"

"তুমি ত আবার শাদি করিবে।"

"কাহার কাছে তুমি শুনিলে!"

"যাহার কাছেই আমি শুনিয়া থাকি। তুমি হলফ করিয়া বল, কথা সত্য কি মিথ্যা।"

মন্‌সব্‌দার ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কহিলেন, "তুমি কি পাগল হইলে নাকি? আমার এত রকম ঝঞ্ঝাট, আমার কি এত সময় আছে যে, আমি আর-একটা বিবাহের ভাবনা ভাবিব?"

ফাতেমা স্বামীর বিরক্তিভাব লক্ষ্য করেন নাই। তিনি কহিলেন, "তুমি ত আমার কথার উত্তর দিলে না। নূতন বিবাহের কথা সত্য কি মিথ্যা, শপথ করিয়া বল।"

কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্ত জলালুদ্দীন ফাতেমাকে আদর করিবার চেষ্টা করিলেন, বেগমের হাত ধরিয়া কাছে টানিলেন। ফাতেমা রাগিয়া হাত ছিনাইয়া লইলেন। কহিলেন, "তবে সত্য কথা, তুমি বনে যাহাকে দেখিয়াছিলে তাহাকে বিবাহ করিবে!"

মন্‌সব্‌দারের প্রথমে বিস্ময়, পরে রাগ হইল। "তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হইয়াছে," বলিয়া তিনি রাগিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ফাতেমা মনে করিলেন, মন্‌সব্‌দারের রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে, আবার ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেন না।

ফিরিবার উপায়ও ছিল না। রাগের মাথায় জলালুদ্দীন যে-পথে আসিয়াছিলেন, সে-পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য দিকে চলিলেন। পথে খদিজা বেগমের মহল। দরজার সম্মুখে বেগম দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জলালুদ্দীন দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া খদিজা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন, কহিলেন, "এখনও ত রাত্রি হয় নাই, এখনি সদর মহলে যাইতেছ কেন?"

জলালুদ্দীন দাঁড়াইলেন, খদিজার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। খদিজা সুন্দরী, নবযুবতী, চক্ষের দৃষ্টি কোমল, উজ্জল, প্রেমপূর্ণ; মস্তকের

বক্ষের ওড়না স্রস্ত হইয়াছে, বক্ষস্থিত হস্তের অঙ্গুলি কম্পিত হইতেছে। জলালুদ্দীন দাঁড়াইয়া সেই প্রেমার্দ্র নয়ন, ঈষৎবিকশিত ওষ্ঠাধর ও অঙ্গে অঙ্গে ঈষচ্চঞ্চল যৌবন-তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন।

এক পদ অগ্রসর হইয়া ব্রীড়াবনত মুখে অতি মৃদু, অতি মধুর কণ্ঠে খদিজা কহিলেন, "আমার কাছে আসিয়া একটু বিশ্রাম কর।" খদিজা কম্পিত অঙ্গুলি দিয়া জলালুদ্দীনের কর স্পর্শ করিলেন। জলালুদ্দীনের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। "চল," বলিয়া জলালুদ্দীনও খদিজার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ফাতেমার আশঙ্কা, নূতন সপত্নী বন হইতে আসিবে, ঘরের সপত্নী যে তাঁহাকে স্বামীর সোহাগ হইতে বঞ্চিত করিবে, এ সম্ভাবনা স্বপ্নেও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট-সন্নিধানে

প্রভাতে বাদশাহ্ তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন, কতক সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। বলের জন্য হকীম ইয়াকুতি ও অপর ঔষধ-মিশ্রিত সরবৎ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল হইয়াছিল। ঔষধের শূন্য পেয়ালা সম্মুখে রহিয়াছে।

পত্রহস্তে ভৃত্য প্রবেশ করিল। ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া পত্র বাদশাহের হস্তে দিল। বাদশাহ দেখিলেন, পত্র খোলা নয়, বন্ধ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পত্র মীর মুন্‌শীকে না দিয়া আমার নিকট আনিলে কেন?"

"হুজুর, মীর মুন্‌শী দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, পত্র তিনি খুলিবেন না, হুজুর স্বয়ং খুলিবেন।"

বাদশাহ্ পত্র আবার দেখিলেন। শিরোনামা পাঠ করিলেন, পত্রের মোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "মীর মুন্‌শী সাহেব সত্য কহিয়াছেন। এ পত্র আর কাহারও খোলা উচিত নয়।"

বাদশাহ্ পত্র খুলিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার ভ্রু কুঞ্চিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কে পত্র আনিয়াছে?"

"উজীর সাহেব তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন।"

"তাহাকে এখানে লইয়া আইস। তাহাকে আগে বসিবার স্থান দাও।"

ভৃত্যের কি শুনিবার ভ্রম হইল? বাদশাহের সম্মুখে বসিবার স্থান? আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে কেহ কখনও তাঁহার সম্মুখে বসে নাই, অন্ততঃ ভৃত্য তো কখনও দেখে নাই।

বসিবার স্থান দিয়া, শূন্য পেয়ালা উঠাইয়া লইয়া ভৃত্য নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

উজীরের সহিত পত্রবাহক বাদশাহের কক্ষে প্রবেশ করিল। বাদশাহ উজীরকে কহিলেন, "আপনার থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহার সহিত আমার গোপনে কথা আছে।"

উজীর ত চলিয়া যান। এমন কি গোপনীয় কথা, যে তিনি শুনিতে পান না? যাইবার সময় কহিলেন, "ইঁহার সহিত বাদশাহ একা—?"

বাদশাহ কহিলেন, "হাঁ, আমি একাই দেখা করিব, কোন চিন্তা নাই।"

উজীরের সঙ্গে যে আসিয়াছিল সে আর কেহ নহে—গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর মাথা নত করিলেন না, পিছু হটিয়া কুর্ণীশও করিলেন না, দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ কহিলেন, "বসুন। বালানন্দজী আপনার সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি।"

"পত্রে আমার পরিচয় আছে?"

"আছে।"

"তথাপি আপনি আমার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতেছেন? আপনার কি কোন আশঙ্কা নাই?"

বাদশাহ রুগ্ন, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল। তথাপি চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। মুহূর্ত্ত পরে সংযতচিত্তে ধীর-কণ্ঠে কহিলেন, "মোগল

আশঙ্কা জানে না। সম্রাট্‌কে যে এমন কথা বলে তাহার সেই শেষ কথা, কিন্তু আপনি সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রিত, আপনার অপরাধ লইব না।"

ঈষৎ-হাস্যমুখে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনি সম্রাট্‌, আমি উদাসী ভিখারী, যদি অযথা কথা বলিয়া থাকি, মার্জ্জনা চাহিতেছি; আপনি ভয়শূন্য; আমাকে কি ভীত মনে করেন?"

বাদশাহের মুখে হাসি দেখা দিল। "আমি ত এমন কথা বলি নাই। আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা হইতে নির্ভীকতার কি পরিচয় হইতে পারে? বরং সিংহের মুখে হস্তপ্রদান করা সহজ, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সম্মুখে শত্রুভাবে আসা কঠিন। কিন্তু এই পত্র আপনার সহায়, আপনি নিশ্চিন্তে আপনার বক্তব্য বলুন। সংক্ষেপে বলিবেন, এই মাত্র অনুরোধ।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সংক্ষেপেই বলিব। আমরা বিদ্রোহী নহি, গোপনে বাদশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না। প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল এবং আপনি প্রজার মঙ্গলে যত্নবান্‌। কিন্তু এই বিশাল রাজ্যে কোথায় কি হইতেছে, আপনি কেমন করিয়া সে সন্ধান রাখিবেন? সহস্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেও সকল সত্য সংবাদ পাইবেন না। সকলেরই মুখ বন্ধ করিবার অমোঘ উপায় আছে। অর্থ দ্বারা কত যে অনর্থ সাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথায় কোন্‌ রাজপুরুষ অথবা কর্ম্মচারী কিরূপ প্রজাপীড়ন করে, আপনি কিরূপে জানিবেন? অর্থ ব্যয় করিলেই সকল অত্যাচার গোপন করা যায়। সুতরাং প্রজাদিগকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিতে হইবে। প্রজা আত্মরক্ষা করিতে শিখিলে অত্যাচার আপনা-আপনি নিবৃত্ত হইবে। ইহাই আমাদের ষড়যন্ত্র, আর কোন দুরভিসন্ধি নাই।"

বাদশাহ কহিলেন, "দুষ্টকে দমন করা রাজার কাজ, প্রজার নহে।"

"মানিলাম। কিন্তু দুষ্টের অনিষ্ট প্রমাণ করিবে কে? সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধ কিরূপে প্রমাণিত হইবে? সত্যকে গোপন করিলে সত্য কিরূপে প্রকাশিত হইবে?"

বাদশাহ কহিলেন, "আপনার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। রাজপুরুষেরা রাজাকর্তৃক নিয়োজিত, অপরাধ করিলে রাজার নিকট অভিযুক্ত হইবে। প্রজারা কিরূপে তাহাদের বিচার করিবে? রাজার ও প্রজার যুগ্ম-শাসন কোথাও শুনিয়াছেন?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আত্মরক্ষা ত শাসন নহে। রাজার ক্ষমতা হরণ করা ত প্রজার উদ্দেশ্য নহে, আমরাও কখন এমন শিক্ষা দিই নাই। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে প্রজার বল হইতেই রাজার বল। প্রজা চিরন্তন, রাজা জলপ্রবাহে বুদ্বুদ মাত্র। চন্দ্র-সূর্য্য-রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রজার লোপ নাই। কোন্ সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী? যুগে যুগে প্রজা আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এই জন্যই উহার বিনাশ নাই।"

বাদশাহ মৌনী হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ প্রসঙ্গে কোন ফল নাই। আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনারা বিদ্রোহী নহেন এবং বিদ্রোহের সূত্রপাত করিতেছেন না, বুঝিলাম। আমার যে উদ্দেশ্য, আপনাদেরও সেই উদ্দেশ্য। আপনারা গোপনে মন্ত্রণা করেন, গোপনে প্রজাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহার কারণ, রাজপুরুষেরা আপনাদের বিরোধী। যদি আপনারা প্রকাশ্যে আমার পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ক্ষতি কি? আপনি যে কয়জনের নাম করিবেন, তাঁহাদিগকে নিয়োগ-পত্র দিব, তাঁহারাও আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সম্রাট্‌, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য, আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবে। আমরা দরিদ্র, দরিদ্রই থাকিব। আমাদের কোন প্রার্থনা নাই, আমাদের কোন প্রলোভন নাই। আমরা রাজ-পুরুষ নহি, আমরা প্রজা-পুরুষ, প্রজার সেবায় দেহপাত করিব।"

সম্রাট্‌ বলিলেন, "যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া আবার আপনার সাক্ষাৎ পাইব ?"

গৌরীশঙ্কর বস্ত্র-মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র তাম্রফলক বাহির করিয়া বাদশাহের হস্তে দিলেন। ফলকে কতকগুলি চিহ্ন ছিল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যে কোন গ্রামবাসীব হস্তে এই তাম্রখণ্ড দিলে আমি জানিতে পারিব যে, বাদশাহ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সন্নিধানে কিরূপে আগমন করিব ? দ্বিতীয় বার কি স্বামীজীর শরণাগত হইব ?"

বাদশাহ কহিলেন, "প্রয়োজন নাই।" শয্যায় উপাধানের পার্শ্বে একটি হস্তিদন্তের ক্ষুদ্র বাক্স ছিল। বাদশাহ খুলিয়া একটি অঙ্গুরী গৌরীশঙ্করকে দিলেন। বলিলেন, "যদি কখন আমার কর্ম্মচারিগণ অথবা রাজ্য-সংক্রান্ত কোন ব্যক্তি আপনাকে কোনরূপ পীড়ন করে, অথবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই অঙ্গুরী প্রদর্শন করিবেন। বিদায়ের পূর্ব্বে আর এক অনুরোধ। আপনি দূরদর্শী, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী পুরুষ। আমার বিশ্বাস, চিকিৎসা শাস্ত্রে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি একবার আমাকে পরীক্ষা করুন।"

গৌরীশঙ্কর সম্রাটের নাড়ী ও দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আপনি কি জানিতে চাহেন ?"

"আমার শরীরের অবস্থা।"

"রোগ কঠিন, রক্ষা পাইবেন না।"

"তাহা জানি। কতদিন আয়ু?"

"দুই মাস, সম্ভবতঃ এক মাস।"

"পুত্রেরা সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবে? কে জয়ী হইবে?"

"শাহজাদা রুস্তম। আপনার সেই ইচ্ছা। আমরাও সেই চেষ্টা করিব।"

দুই-হস্ত দ্বারা বাদশাহ গৌরীশঙ্করের হস্ত ধারণ করিলেন, আর্দ্র চক্ষে কহিলেন, "আপনার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। আমাদের আর একবার দেখা হইবে।"

গৌরীশঙ্কর বাহিরে আসিলে উজীর প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দান

গৌরীশঙ্করের বেশ সাধারণ ভদ্রলোকের মত, কোনরূপ পারিপাট্য ছিল না। সহরে একজন সাধারণ দোকানদারের গৃহে বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসের জন্য দোকানদার একটি ভাল ঘর দিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর সেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার লোক-জন কেহ ছিল না। তিনি কোথায় যাইতেন, কি করিতেন, দোকানদার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

বাসায় ফিরিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গৌরীশঙ্কর বসিয়া আছেন, এমন সময় দ্বারে আঘাত হইল। গৌরীশঙ্কর দরজা খুলিয়া দেখিলেন, এক জন খোজা দাঁড়াইয়া আছে। কোন ধনীর মহলের ভৃত্য হইবে। গৌরীশঙ্কর তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন, "আমি বিদেশী, মোসাফির, আমার সহিত তোমার কি প্রয়োজন ?"

খোজা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "বাদশাহের অন্দর-মহলে প্রধান বেগম সিরাজী সাহেবার আমি ভৃত্য। যদি বাদশাহ জানিতে পারেন, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে আমার কতলের হুকুম হইবে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোজার প্রতি চাহিয়া গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "তবে আসিলে কেন ?"

দক্ষিণ হস্ত উল্টাইয়া খোজা কহিল, "বেগমের আদেশে। যদি

তাঁহার আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে রাত্রিকালে যমুনায় কুম্ভীরে আমার দেহ ভক্ষণ করিবে। উভয় পক্ষে মৃত্যু নিশ্চিত।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এমন চাকরী সুখের নহে।"

খোজা বলিল, "আমি ক্রীতদাস, আমার জীবনের মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে।"

"আমি সামান্য পথিক, এখানে আমি ত্রিরাত্রিও বাস করিব না। আমার সম্বন্ধে বেগম কি জানেন, আর তোমাকেই বা কেন এখানে পাঠাইয়াছেন? ইহাতে আমারও আশঙ্কা।"

"বেগম বলিয়াছেন, আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনি আজ শাহন্‌শাহার নিকট গিয়াছিলেন, বাদশাহ আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন?"

"জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কথার উত্তর পাইবে না। তোমার কি বলিবার আছে, বল।"

"আপনি কে বেগম জানেন, আপনার ক্ষমতাও তিনি অবগত আছেন। সাধারণে না জানিলেও বেগম জানেন বাদশাহের পীড়া সাংঘাতিক, আরোগ্য হইবেন না। বাদশাহের ভাল-মন্দ কিছু হইলেই সিংহাসনের জন্য দুই শাহজাদায় যুদ্ধ বাধিবে। বেগমকে আত্মরক্ষার জন্য এক পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। বেগমের আদেশ-মত আপনাকে সকল কথা স্পষ্ট বলিলাম। বেগম আপনার পরামর্শ ভিক্ষা করেন।"

গৌরীশঙ্করের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কহিলেন, "বেগম স্বয়ং বুদ্ধিমতী, এমন কি, বুদ্ধিবলে তিনি বাদশাহকে আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি কি এ বিষয়ে কিছু ভাবেন নাই?"

"অনেক ভাবিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শাহজাদা রুস্তমের পক্ষ অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।"

"বেগমের বিবেচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।"

"আপনিও সেই পরামর্শ দেন ?"

"সিরাজী বেগম সাহেবাকে পরামর্শ দিব আমার এমন স্পর্দ্ধা নাই। তবে আমার মনে হয়, বেগমের বিবেচনা উত্তম।"

খোজা বুঝিল। সে কহিল, "দাসের প্রতি আর কোন আদেশ আছে ?"

"আমার কিছুই বলিবার নাই।"

খোজা বস্ত্রের ভিতর হইতে আশরফির তোড়া বাহির করিল। কহিল, "দরিদ্র প্রজাদিগের জন্য বেগম যৎসামান্য সাহায্য পাঠাইয়াছেন।"

"প্রজার জন্য, না আমার পুরস্কার স্বরূপ ?"

"জনাব, আপনাকে বেগম এমন অপমান করিতে পারেন না।"

তোড়া রাখিয়া খোজা চলিয়া গেল।

দোকানদার সেই সময় আসিয়া উপস্থিত। দেখিল, খোজা বাহির হইয়া যাইতেছে। দোকানদার আসিয়া গৌরীশঙ্করকে প্রণাম করিল। কহিল, "মহারাজ, বাদশাহের মহলের খোজা বাহির হইয়া গেল। এখানে কেন আসিয়াছিল ?"

গৌরীশঙ্কর হাসিলেন, "তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ?"

"আমার কি এমন মাথার উপর মাথা আছে যে, জিজ্ঞাসা করিব ?"

"তবে এখন কেন করিতেছ ?"

"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। কোন বিপদ্ হইবে না ত ?"

"কি জানি ? বিপদ তোমার, না আমার ?"

"আপনি জানেন। আমরা সামান্য ব্যবসাদার, এ-রকম লোক এখানে আসিলে আমারই বিপদ্।"

"কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের দুই জনের কাহারও কোন বিপদ হইবে না।"

তোড়ার উপর দোকানদারের নজর পড়িল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি এ?"

"আশর্ফির তোড়া।"

"কে দিল? খোজা রাখিয়া গিয়াছে?"

"আর ত কেহ এখানে আসে নাই। কে দিয়াছে খোজা বলিতে পারে।"

"কাহার জন্য?"

"দরিদ্র প্রজাদের জন্য।"

দোকানদার কহিল, "শহরে ত অনেক গরিব প্রজা আছে, আমিও গরিব।"

গৌরীশঙ্কর দুইটি আশর্ফি বাহির করিয়া দোকানদারের হাতে দিলেন। কহিলেন, "আশর্ফি ভাঙ্গাইয়া গ্রামে বিতরণ করিবে, শহরে নয়।"

দোকানদার চুপ করিল। পর দিবস গৌরীশঙ্কর শহর ত্যাগ করিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

বিহারীলাল পুণ্ডরীককে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। বনবাসিনী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে। কেন? বিহারীলাল এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

যে বৃক্ষের মূলে গহ্বর দেখিয়াছিল, পুণ্ডরীক বিহারীলালকে সেই স্থানে লইয়া গেল। গহ্বর মুক্ত, তাহার উপর কোন আচ্ছাদন নাই। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বনবাসিনী।

বনবাসিনী বিহারীলালকে কহিল, "আমার বাসস্থান কেহ দেখিতে পায় নাই। পুণ্ডরীক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। আজ আপনিও দেখিতে পারেন।"

রমণী গহ্বরে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে বিহারীলাল ও পুণ্ডরীক। গহ্বরের অভ্যন্তরে দুইজন মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা পথ দেখাইয়া চলিল।

কিছুদূর গিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে বসিবার মৃগচর্ম্ম, আহারের জন্য ফল-মূল। রমণী সেখানে অপেক্ষা করিল না। মশালচি-দিগকে কহিল, "আগে যাও।"

সুড়ঙ্গের পথ দিয়া তাহারা অনেক দূর গেল। সুড়ঙ্গ শেষ হইলে তাহারা আবার বাহিরে সূর্য্যালোকে আসিল। সম্মুখে ভগ্ন প্রাচীন মন্দির। রমণী কহিল, "আসুন।" বিহারীলাল ও রমণী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পুণ্ডরীক ও অপর দুই ব্যক্তি বাহিরে রহিল। সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া তাহারা মশাল ফেলিয়া দিয়াছিল।

মন্দিরের ভিতরে পরিষ্কার, কিন্তু কোন বিগ্রহ নাই। মার্জ্জিত প্রস্তরের উপর রমণী বসিল। বিহারীলাল কিছু দূরে উপবেশন করিলেন।

রমণী কহিল, "আপনাকে অসঙ্কোচে এই নিভৃভ স্থান দেখাইয়াছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এখানে আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।"

বিহারীলালের মুখ ম্লান হইয়া গেল, রমণী তাহা লক্ষ্য করিল। বিহারীলাল কহিলেন, "কেন?"

"এখানকার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ আমি এখানে কখনই বাস করিতাম না, আসিতাম-যাইতাম মাত্র। ঐ দেখুন।"

মন্দিরের বাহিরে অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট দিকে বিহারীলাল চাহিয়া দেখিলেন। অতি মনোহর বেগবান্ অশ্ব তরুশাখায় বদ্ধ রহিয়াছে। পাশে সহিস দাড়াইয়া। বিহারীলাল কোন কথা কহিলেন না।

রমণী আবার কহিল, "আপনার পরিচয় আমি জানি, আপনি আমার পরিচয় জানেন না। আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা, আপনি জানেন। আমার নাম জয়ন্তী। সকল পরিচয় দিতে পারিব না। যাঁহাদের আদেশ-মত আমি এই বনে আসি, তাঁহারা মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার সহায়তা-প্রার্থী এবং সে প্রার্থনা নিবেদন করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

"তাঁহাদের ব্রত কি জানিতে পারি?"

"প্রজার মঙ্গল সাধন।"

"ইহার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত নাই। আমাকে কি করিতে হইবে?"

"তাঁহারা স্বয়ং আপনাকে বলিবেন। কল্য সন্ধ্যার সময় আপনার গৃহে তাঁহারা গমন করিবেন। আপনার অনুমতি পাইলে তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"কাল যে হোলি!"

"তাঁহাদের বিবেচনায় এই উত্তম সুযোগ। তাঁহারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ন্যায় যাইবেন, আপনি পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিবেন। এই সঙ্কেত।" জয়ন্তী হস্তদ্বারা বিহারীলালকে সঙ্কেত দেখাইয়া দিল। অপরের অলক্ষ্যে সে সঙ্কেত করিতে পারা যায়।

বিহারীলাল কহিলেন, "কি নাম?"

"অযোধ্যানাথ। তাঁহার সঙ্গীদিগের পরিচয় তিনি দিবেন।

"তাহাই হইবে।"

জয়ন্তী মন্দির হইতে বাহির হইয়া অশ্বের অভিমুখে চলিল।

বিহারীলাল কহিলেন, "আপনার সঙ্গে ঐ পর্য্যন্ত যাইব?"

"স্বচ্ছন্দে আসুন।"

অশ্বের সমীপে উপনীত হইয়া বিহারীলাল অশ্বের মুখ ধারণ করিলেন। অশ্বপাল সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। অভ্যস্ত অশ্বারোহীর ন্যায় জয়ন্তী অবলীলাক্রমে অশ্বে আরোহণ করিল। বিহারীলাল অশ্বের মুখ ছাড়িয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিলেন। বল্গা ধারণ করিবার সময় জয়ন্তীর হস্ত বিহারীলালের হস্তে ঠেকিল। জয়ন্তীর হাত কাঁপিতেছিল। বিহারীলাল মুহূর্ত্ত মাত্র কাল জয়ন্তীর হস্তের উপর আপনার হস্ত রক্ষা করিলেন।

বিহারীলাল অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিলেন, "আবার সাক্ষাৎ হইবে?"

জয়ন্তী কহিল, "তাহার উপায় ত আপনি নিজে করিয়াছেন। এখন আপনি আমাদের এক জন। সাক্ষাৎ হইবেই।"

যুবক ও যুবতীর দৃষ্টি চক্ষে চক্ষে মিলিল। জয়ন্তীর মুখ প্রথমে রক্তবর্ণ, তৎপরেই পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বিহারীলাল কহিলেন, "কবে সাক্ষাৎ হইবে?"

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর জড়িত হইল, সেই সঙ্গে অধর-প্রান্তে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিল, কহিল, "কেমন করিয়া বলিব?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শাহজাদা হাতিম

বাসীনের বারাদরীতে শাহজাদা হাতিমের কিছুমাত্র মনের সুখ ছিল না। তিনি নিজেকে বন্দী বিবেচনা করিতেন। কথা কতকটা সত্য বটে। শাহজাদার ইচ্ছা, রাজধানীতে ফিরিয়া যান। বাদশাহের আদেশ না পাইলে সে সাধ্য নাই। শরীর সুস্থ হইয়াছে লিখিলে আবার সেই বীজাপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বারাদরী অর্থে বারটা দরজা। বাস্তবিক সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই রাজপ্রাসাদে বারটা দরজা ছিল না, কিন্তু চারিদিক খোলা। অতি রম্য স্থান। কিন্তু শাহজাদা স্বেচ্ছায় সেখানে যান নাই, এইজন্য তিনি কিছুতেই আনন্দ অনুভব করিতেন না।

সম্মুখে মুক্ত নীল সমুদ্র আকাশপ্রান্তে মিশিয়াছে; সমুদ্র হইতে নিরন্তর হু হু করিয়া বায়ু বহিতেছে। অষ্ট প্রহরে দুই বার জোয়ার-ভাঁটার খেলা, কখন অবিশ্রান্ত সমুদ্রগর্জ্জন, পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গভঙ্গ, ফেনকিরীটিনী উর্ম্মিমালার উত্থান-পতন, কভু বা নির্ব্বাত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সলিলরাশি। নিত্য এই অপূর্ব্ব দৃশ্য বৃথায় শাহজাদার দৃষ্টি-গোচর হইত। না সমুদ্র দর্শনে, না সমুদ্র ভ্রমণে, শাহজাদার আনন্দের লেশ ছিল। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চিন্তা সিংহাসনের জন্য। আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইবে—তাহার অধিক বিলম্বও নাই—তখন কে সে সিংহাসনের অধিকারী হইবে, কে তখ্‌ৎ-তাউসে উপবেশন করিয়া দরবার-ই-আম্‌ উজ্জ্বল করিবে? হাতিম বাদশাহের জ্যেষ্ঠ

পুত্র, তিনি থাকিতে কনিষ্ঠ রুস্তম কেমন করিয়া সিংহাসনের দাবী করিতে পারে? ভ্রাতাই ত শত্রু, ভ্রাতাই ভ্রাতাকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে।

শাহজাদা হাতিমের সঙ্গে দুই শ্রেণীর লোক,—এক মোসাহেবের দল, দ্বিতীয় পরামর্শদাতা। প্রথম দলের সংখ্যা অধিক। তাহারা নানা উপায়ে সম্রাট্-পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে তাহারা কাল কাটাইত, শাহজাদাকেও সেই সঙ্গে জড়াইত। কখন সমুদ্রে নৌকাবিহার, কখন মৃগয়া, কখন নৃত্যগীত—এইরূপে কাল কাটাইত, কিন্তু হাতিম কিছুতেই রাজ্যের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। তিনি অনেক সময় প্রমোদ-মত্ত বয়স্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রৌঢ় পরামর্শদাতাদিগের সহিত রাজ্যের ও রুস্তমের কথা কহিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ ইস্মাইল প্রধান। ইস্মাইল কহিতেন, "গুপ্তচরের নিকট পাকা কোন সংবাদ না পাইয়া সহসা কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আপনি যদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে সে সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে বাদশাহের নিকট পঁহুছিবে এবং তিনি রাগান্বিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ্যে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।"

হাতিম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "বাদশাহ ত আমাকে একরূপ নির্ব্বাসনে রাখিয়াছেন। এখন যদি কিছু হয়, তাহা হইলে রুস্তমের পক্ষে সিংহাসনের পথ অবারিত।"

"আপনার কি স্মরণ নাই যে, শাহজাদা রুস্তম পূর্ব্বদেশে প্রেরিত হইয়াছেন? রাজধানী হইতে তিনি আপনার অপেক্ষাও দূরে।"

আপত্তি ঠেলিয়া হাতিম কহিলেন, "তাহার অনেক সৈন্যবল,

বুন্দেলখণ্ডে সে যশস্বী হইয়াছে, বাদশাহের কিছু হইলে ফৌজ তাহার পক্ষে হইবে, তখন কে তাহার গতিরোধ করিবে ?”

ইস্মাইল কহিলেন, “শাহজাদা, হিম্মত কখন হারাইবেন না, তাহা হইলেই সব গেল। আমরা শুধু খবরের অপেক্ষায় আছি। খবর পাইলেই দিনরাত কুচ করিয়া আপনি শাহজাদা রুস্তমের পূর্ব্বেই রাজধানী প্রবেশ করিবেন সেখানে গিয়া একবার সিংহাসন দখল করিলে বাদশাহী আপনার, প্রজা সৈন্য আপনার তরফ হইবে, কাহার সাধ্য আপনার বিরুদ্ধে কিছু করে ? আপনি অনর্থক চিন্তা করিবেন না।”

এ-কথা শুনিয়া হাতিমের ভরসা হইল, তিনি গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন।

দুই চারিদিন পরেই গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল, বাদশাহের পীড়া কঠিন, আর গোপন করিবার উপায় নাই। রাজধানীতে রাষ্ট্র হইয়াছে, বাহিরেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শাহজাদা হাতিম সেইদিনই রাজধানী যাত্রা করিলেন। সৈন্য-শিবিরে আদেশ প্রেরিত হইল,—সেনাপতি সসৈন্যে অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শাহজাদা রুস্তম।

সাম্রাজ্যের আর-এক প্রান্তে শাহজাদা রুস্তমও সিংহাসনের ভাবনা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর এক প্রকৃতির লোক। হাতিমের মত দুর্ব্বল-প্রকৃতি ও অস্থিরচিত্ত নহেন। সকল বিষয়ে তাঁহার আত্মনির্ভর, যেমন মনের বল তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা। এমন নহে যে তিনি বিলাসী ছিলেন না, কিন্তু কিছুতেই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। মোসাহেবেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিত, বিজ্ঞেরা অযাচিতভাবে কোন পরামর্শ দিতেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, শাহজাদা তাঁহাদের অপেক্ষা চতুর, বয়সে যুবা কিন্তু কূটরাজনীতিতে বৃদ্ধেরা তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার আলস্যশূন্য কার্য্য ও সতর্কতা, তাঁহার মিষ্টভাষিতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রখর বুদ্ধি যে লক্ষ্য করিত, সে-ই বুঝিতে পারিত যে, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক ইনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

রাজধানীর সংবাদ গুপ্তচর প্রতিদিন লইয়া আসিত। রুস্তমের অসংখ্য গুপ্তচর, অনবরত যাতায়াত করিত। বাদশাহের মৃত্যু আসন্ন, তাহা শাহজাদা রুস্তম উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। রাজধানীর অভিমুখে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবার একটা কৌশল তিনি উদ্ভাবন করিলেন। এক দল বিদ্রোহী পরাজিত ও ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি বাদশাহকে জানাইলেন, আর-এক দল বিদ্রোহী আজমগড় হইতে এলাহাবাদে যাইতেছে, সেখানে দুর্গ আক্রমণ করিয়া আগ্রার দিকে যাইবে।

শাহজাদাও সসৈন্যে সেই দিকে চলিলেন। বস্তুতঃ বিদ্রোহীদের সংখ্যা অল্প ও তাহারা হীনবল। শাহজাদার স্বয়ং যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি এমন সুযোগ ছাড়িবার লোক নহেন।

সেনানায়কদিগের সহিত রুস্তম গোপনে পরামর্শ করিতেন। তাহারা সকলেই তাঁহার পক্ষে, সকলে শপথ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। সৈন্যদের মধ্যেও এ-কথা গোপনে প্রচারিত হইয়াছিল। শিবিরে শাহজাদা স্বয়ং সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন, সজ্জিত সেনার সাক্ষাতে যে সময় তিনি অশ্বারোহণে আগমন করিতেন, তখন তাহারা উল্লাস-ধ্বনি করিয়া বজ্রনাদে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিত। শাহজাদা যে ভাবী বাদশাহ, তাহাতে তাহাদের কিছু সংশয় ছিল না।

বাদশাহের সংবাদ দিন দিন আরও মন্দ আসিতে লাগিল, কিন্তু শাহজাদা রাজধানীতে যাইবার কোন আদেশ পাইলেন না। তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। বাদশাহ মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু তিনি কোন পুত্রকে আহ্বান করা দূরে থাকুক, দুইজনের একজনকেও পীড়ার সংবাদ দেন নাই। তাঁহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?

শাহজাদা এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কানপুরের নিকট শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হইলে সেনাপতি আসিয়া নিবেদন করিলেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। শাহজাদার আদেশ ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রয়োজন?"

"সে বলিতেছে হুজুরের সাক্ষাতে বলিবে, আর কাহাকে কিছু বলিবে না।"

"ডাক তাহাকে।"

প্রহরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া শাহ্জাদাকে অভিবাদন করিলেন; মস্তক অবনত করিয়া, পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন না।

সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "কাহার সম্মুখে আসিয়াছ, জান?"

অল্প হাসিয়া গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "শাহ্জাদা রুস্তমকে কে না জানে? কিন্তু বাদশাহের উপর বাদশাহ আছেন, আমরা অবনত মস্তকে কেবল তাঁহারই বন্দনা করি।"

শাহ্জাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"সেই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, কিন্তু অপরের সাক্ষাতে বলিতে পারিব না।"

ভয় কি, শাহজাদা তাহা জানিতেন না। তিনি বলবান্, অস্ত্রকুশলী, পাশে সকল সময় তরবারি থাকিত। গৌরীশঙ্কর নিরস্ত্র। শাহ্জাদা সেনাপতিকে কহিলেন, "আপনি আপনার তাঁবুতে যান। আমার তাঁবুর বাহিরে প্রহরী যেন হাজির থাকে।"

সেনাপতি চলিয়া গেলেন।

শাহ্জাদা কহিলেন, "এখন তৃতীয় ব্যক্তি নাই, তোমার পরিচয় দাও।"

স্নিগ্ধ ধীরস্বরে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনি যে ষড়যন্ত্রকারীদের কথা শুনিয়াছেন, আমি তাহাদের দলপতি।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সম্রাট্-পুত্র কহিলেন, "কোন্ সাহসে তুমি এখানে আসিয়াছ? তুমি এখনি বন্দী হইবে। কাল তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

অবিচলিত ভাবে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আমি স্বয়ং আসিয়াছি, আপনি আমাকে ধরিয়া আনেন নাই, আপনার কর্ম্মচারীরা আমাকে ধরিতেও পারে নাই। আমাকে বন্দী করিবার অথবা বধ করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য শুনিলে দোষ কি?"

"বলিয়া যাও।"

"আমরা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যে কি অনিষ্ট করিয়াছি? কাহারও কিছু লুটপাট করিয়াছি, কোথাও বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়াছি? প্রজাকে আত্মসম্মান, আত্মরক্ষা শিখাইলে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ হয় না, রাজ্যের মঙ্গল হয়। ষড়যন্ত্রকারী বলিলে আমাদের অযথা অপবাদ করা হয়।"

"আর কিছু বলিবার আছে?"

"আছে বলিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য রাজধানীতে যাইতেছেন। বাদশাহের মৃত্যু আসন্ন। আপনি বাদশাহ হইলে কি প্রজাপীড়ন নিবারণ করিবেন, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমদর্শী হইবেন?"

ক্রোধে শাহজাদার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কে?"

"আমার পরিচয় ত আপনি পাইয়াছেন। আমি প্রজার মুখপাত্র।"

"আজ রাত্রে বন্দী থাক। প্রাতঃকালে জল্লাদের নিকট উত্তর পাইবে। তোমার মুণ্ড বর্শায় বিদ্ধ করিয়া ফৌজের অগ্রে লইয়া যাইবে।"

তখন গৌরীশঙ্কর মাথা তুলিয়া দৃপ্ত স্বরে কহিলেন, "আপনার সাধ্য নাই যে, আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন।"

নিমেষমাত্র শাহজাদা নির্ব্বাক্ হইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, "প্রহরী !"

প্রহরী আসিল। শাহজাদা কহিলেন, "এই ব্যক্তিকে বন্দী কর !"

গৌরীশঙ্কর বাদশাহের প্রদত্ত অঙ্গুরী বাহির করিয়া শাহজাদাকে দেখাইলেন। শাহজাদা মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলেন। প্রহরীকে কহিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, ইনি আমাদের বন্ধু। তুমি বাহিরে যাও।"

প্রহরী বাহিরে গেল।

শাহজাদা কহিলেন, "আপনি সত্য বলিয়াছেন, আপনাকে স্পর্শ করিবার আমার ক্ষমতা নাই।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আমি আপনাকে বৃথা গর্ব্বের বাক্য বলি নাই।"

"তাহা দেখিতেছি। এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা হয়, যাইতে পারেন।"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।"

"বাদশাহের নিদর্শনে আমি আপনাকে কোন রূপ বাধা দি[illegible] পারি না, কিন্তু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আপনার অধিকার নাই।"

"আর-একটা প্রশ্ন করি। কাল আপনি কোথায় গিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিবেন ?"

"কানপুরে।"

"সসৈন্যে ?"

"সৈন্য ছাড়িয়া আমি অগ্রে যাই না।"

"কাল যদি সসৈন্যে কানপুর পৌছিতে না পারেন ?"

"কে আমার গতিরোধ করিবে ?"

"আমি।"

"আপনি বাতুল হইয়াছেন।"

"কাল আবার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আপনার মত পরিবর্ত্তন হয় কি না বোঝা যাইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রশ্নের উত্তর

পর দিবস প্রত্যূষে শিবির ভঙ্গ করিয়া সৈন্যের যাত্রা করিবার কথা ; রাত্রিশেষে তুমুল কোলাহলে রুস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

সেলাম করিয়া প্রহরী বলিল, "হুজুর, সব ঘোড়া দড়ী ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে, পাওয়া যাইতেছে না।"

এমন সময় সেনাপতি আসিলেন। তিনি কহিলেন, "এখানে ত কোন দুশ্‌মন্ নাই, বিদ্রোহীরাও অনেক দূরে ; কিন্তু ইহা যে কোন দুশ্‌মনের কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

শাহজাদা কহিলেন, "অশ্বগুলা পলাইল কেমন করিয়া ?"

"কোন দুষ্ট লোকে তাহাদের দড়ী খুলিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু একজনের কাজ নয়।"

"সব ঘোড়া খুলিয়া দিয়াছে ?"

"না জনাব, কতকগুলা আছে। আপনার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।"

"ঘোড়াগুলার তল্লাস হইতেছে ?"

"শাহজাদা, অনেক সিপাহী ও সহিস খুঁজিতে গিয়াছে।"

শাহাজাদা সেনাপতির সহিত শিবিরে প্রবেশ করিলেন্। সেখানে অত্যন্ত গোলমাল, সিপাহীরা নানা রকম তর্কবিতর্ক করিতেছে। শাহজাদাকে দেখিয়া গোল থামিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ কিছু জানিতে পার নাই ?"

"খোদাবন্দ, কিছুই না। দুই একটা ঘোড়া ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে রকম ত হামেশাই ডাকে।"

আর-একজন বলিল, "হুজুর, ঘোড়া চুরি গিয়া থাকিবে, এদেশে নাকি অনেক ঘোড়ার চোর আছে।"

অপর কেহ বলিল, "নিশ্চয় বিদ্রোহীদের কাজ।"

শাহজাদা হাত তুলিতেই আবার সকলে চুপ করিল। তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়ায় চড়িয়া কেহ গিয়াছে?"

"পাঁচ ছয় জন গিয়াছে।"

প্রভাত হইল। যাহারা খুঁজিতে গিয়াছিল, তাহারা একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। অনেক দূরে মাঠে অশ্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অশ্বের সংখ্যা অনেক, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনটা বা সহজে ধরা যায় না, সকলগুলাকে সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল। ভোরে পাঁচটার সময় ফৌজ কুচ করিবার কথা, বাহির হইতে আটটা বাজিল। শাহজাদা রাগিয়া অস্থির।

অর্দ্ধক্রোশ পথ না যাইতেই রুস্তমের ঘোড়া খোঁড়াইতে আরম্ভ করিল। শাহজাদা নামিলেন। চারি পায়ের খুর উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই চলিতে পারে না। পল্টনের সঙ্গে এক জন ভাল নালবন্দ ছিল; অবশেষে সে আসিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহির করিল যে, ঘোড়ার পিছনের একটা পায়ে এভাবে একটা সরু সূচ বিদ্ধ আছে যে, চলিতে গেলেই তাহার পায়ে লাগে। নালবন্দ সূচ বাহির করিয়া দিল, কিন্তু বলিল, দুই এক দিন ঘোড়া সওয়ারীর মত থাকিবে না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শাহাজাদা কহিলেন, "ঘোড়ার পায়ে সূচ কেমন করিয়া বিঁধিল?"

নালবন্দ কহিল, "গরিব-পরওয়র, এ সূচ আপনি বিঁধিয়া যায় নাই। অত্যন্ত কৌশলের কাজ, যে-সে ইচ্ছা করিলে পারে না।"

শাহজাদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মেজাজ বড় খারাপ হইয়া গেল।

পদে পদে এই রকম বিঘ্ন-বাধা ঘটিতে লাগিল। কোন সওয়ারের রেকাব খসিয়া যায়, কাহারও বা তরবারির খাপ পড়িয়া যায়। সমস্ত সৈন্য বদমেজাজ হইয়া উঠিল। [illegible]

তিন ক্রোশ [illegible] হইল। সম্মুখে একটা-গ্রাম। [illegible] করিতে চায়—সেনা[illegible]

শাহজা[illegible] হউক, কানপুরে পৌঁছি[illegible] বিশ্রাম করিতে পারে; [illegible]

"বার ক্রোশ।"

"এখানে বিশ্রাম করিতে পা[illegible]

ততক্ষণে গ্রাম উপস্থিত হইল। [illegible] হুকুমের অপেক্ষা করিল না। অশ্বারোহিগণ না[illegible] বৃক্ষচ্ছায়ায় বন্দুক রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

দেখিয়া শাহজাদা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কহিলে[illegible] হুকুমে ইহারা দাঁড়াইল?"

সেনাপতি কহিলেন, "মধ্যাহ্নের সময় সৈন্যেরা বিশ্রাম করে। অভ্যাস মত ইহারা কুচ বন্ধ করিয়াছে।"

"আমি কোন হুকুম দিই নাই। ইহাদিগকে আর এক চটী পর্যন্ত যাইতে হইবে।"

সেনাপতি কহিলেন, "গ্রামে বণিকের দোকান বন্ধ, কূপের মুখে কাঁটা. এ লোকটা গ্রামের চৌধুরী, বলিতেছে কিছু জানে না!"

শাহজাদা কহিলেন, "ইহাকে আরও গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

বন্ধনমুক্ত হইয়া চৌধুরী শাহজাদার চরণে পতিত হইল। কহিল, "জাঁহাপনা, আমি কিছু জানি না, আমার কোন অপরাধ নাই।"

শাহজাদা নিজে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বণিক কোথায় ?"

"ধর্ম্মাবতার, তাহা ত বলিতে পারি না।"

"কাল রাত্রে এখানে ছিল ?"

"হাঁ হুজুর, কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাহার নিকট আটা কিনিয়াছিলাম।"

"কূপ বন্ধ কেন ?"

"কাল সন্ধ্যার সময় সকলে জল তুলিয়াছে। কূপের মুখে কাঁটা ছিল না।"

শাহজাদা আদেশ করিলেন, "বণিককে গ্রামে দেখ।"

গ্রামে তাহাকে পাওয়া গেল না। শাহজাদা কহিলেন, "চৌধুরী, দাঁড়াও। দোকান খুলিয়া মাল লইয়া তাহার মূল্য তোমাকে দিয়া যাইব।"

সৈনিকেরা দরজা বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিতরে চারিদিকে শূন্য ভাণ্ড পাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, মাল কিছু নাই। ক্রোধান্ধ হইয়া সৈনিকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা গ্রাম লুটিব।"

শাহজাদা হাত তুলিলেন, গোল থামিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তাহা হইলে আমার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না, রাজধানীতে অথবা বাদশাহের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। আগের চটীতে চল, সেখানে রসদ পাওয়া যাইবে।"

সৈন্যেরা তখন প্রকাশ্যে অবাধ্য হইয়া উঠিল। কয়েক জন বলিয়া উঠিল, "খাইতে না পাইলে আমরা আর এক পাও যাইব না।"

সেনাপতি শাহজাদাকে ইঙ্গিত করিলেন। শাহজাদা সরিয়া আসিলেন।

কিছু দূরে গিয়া সেনাপতি কহিলেন, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, উহাদের মেজাজ বিগড়াইয়াছে। এখন যে অবাধ্যতা দেখিলেন, ইহা বিদ্রোহের সূচনা। আপনি ত সকলই জানেন, বুঝিয়া দেখুন কি করা কর্ত্তব্য।"

শাহজাদা ভাবিতেছিলেন। কহিলেন, "এখন কিছু করা যায় না। উহাদিগকে আর পীড়াপীড়ি করা চলে না। আপনি দেখিবেন, যেন কেহ কোন অত্যাচার না করে। বৈকালে রৌদ্র পড়িলে পর একটা-কিছু ব্যবস্থা করা যাইবে।"

সিপাহীরা গ্রাম লুটিল না বটে, কিন্তু তাহারা আর উঠিল না। সঙ্গে যাহা-কিছু ছিল, আহার করিয়া গাছতলায় পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত যায়, এমন সময় শাহজাদা সেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "এইবার সৈন্য চালনা করুন, আগের চটীতে রসদ পাওয়া যাইবে।"

সেনাপতি মাথা নাড়িলেন, "সিপাহীরা আরও বাঁকিয়াছে। আহার করিতে না পাইলে তাহারা যাইবে না; অনেকে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে।"

শাহজাদা কহিলেন, "গ্রামে সন্ধান করিয়াছিলেন?"

"চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ঘরে ঘরে দেখিয়াছি, গ্রামবাসী-দিগকে পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছি। গ্রামে পঞ্চাশ জন লোকের মতও খোরাক নাই।"

শাহজাদা কহিলেন, "আমি গিয়া সৈন্তদিগকে বুঝাইব ?"

"এ সময় আপনার না যাওয়াই ভাল। কোন মতে রসদের যোগাড় করিতে হইবে।"

"সিপাহীরা কেহ যাইবে না ?"

"না।"

"তবে আপনি গ্রামের কিছু লোক লইয়া গিয়া অন্য কোন স্থান হইতে চাল আটা যাহা পাওয়া যায়, লইয়া আসুন।"

সেনাপতি গ্রামে গমন করিলেন। শাহজাদা চিন্তায় আকুল হইলেন। এই সৈন্যের ভরসায় তিনি বাদশাহী প্রাপ্তির স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন ? এক বেলা না খাইতে পাইয়াই ইহারা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ভরসা কতক্ষণ ?

শাহজাদার একটা ছোট তাঁবু পড়িয়াছিল। তিনি তাঁবুর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিলেন, এক অশ্বারোহী মাঠ পার হইয়া তাঁবুর অভিমুখে আসিতেছে। সে তাহার সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অভিবাদন করিল। শাহজাদা চিনিলেন, পূর্ব্বরাত্রের সেই ব্যক্তি! জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে ?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "রাত্রে আপনাকে ত বলিয়াছিলাম, আবার সাক্ষাৎ হইবে। আর কি কথা হইয়াছিল আপনার স্মরণ আছে, কেন না আপনি কিছু ভুলিয়া যান না। আপনি কানপুরে পৌছিয়াছেন ?"

"আপনি আমার অবমাননা করিতেছেন ?"

"না, সত্য কথা বলিতেছি। আপনি আজ কানপুরে পঁহুছিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, আপনি তাহা পারিবেন না। ফলে, আমার কথাই সত্য হইয়াছে। কারণ, কানপুর অনেক

দূরে, সুতরাং আজ আপনি কিছুতেই সেখানে পঁহুছিতে পারিবেন না।"

"আজিকার সকল বাধা আপনার উদ্যোগে হইয়াছে?"

"আমার সঙ্গে অপর লোক আছে।"

"আপনি বিদ্রোহী, নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন। এখন বাদশাহের নিদর্শনেও নিস্তার পাইবেন না। আপনাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইব, বাদশাহ স্বয়ং আপনার বিচার করিবেন।"

"তথাস্তু। কিন্তু আপনি যাইবেন কেমন করিয়া? আজ যাহা দেখিলেন, তাহা কিছুই নহে। আমাকে বন্দী করিলে আপনার সৈন্য অচল হইবে, কাল হইতে আহার একেবারেই জুটিবে না।"

"এ কথা যদি সৈন্যেরা শুনিতে পায়, তাহা হইলে আপনাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে।"

"শাহজাদা, যে মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহাকে অনর্থক মৃত্যুভয় দেখাইতেছেন। বরং আমার সহিত সদ্ভাব হইলে আপনার লাভ হইবে।"

"আপনি কি চান?"

"কাল রাত্রে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার উত্তর, আর কিছু না।"

"আমি সম্রাট্ হইলে প্রজার মঙ্গল সাধন করিব, জাতিভেদে অথবা ধর্ম্মভেদে কোন বিচার করিব না।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনার পথ অবারিত হইল। এখন আজ্ঞা করুন, সৈন্যদিগের মনস্তুষ্টির উপায় করি।"

"আপনি কি করিবেন?"

"আমাকে কিছু সময় দিন," বলিয়া গৌরীশঙ্কর অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল। সৈন্যেরা পরিতোষপূর্ব্বক প্রচুর আহার করিল। তাহার পর শাহজাদার জয়ধ্বনি করিয়া তাহারা যাত্রা করিল। সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রভাতে তাহারা কানপুরে পৌঁছিল।

শাহজাদা রুস্তম সে রাত্রে আর গৌরীশঙ্করকে দেখিতে পাইলেন না।

২।৮

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

খদিজার জিত

রাজপুত রাণীদের একটা করিয়া মান-গৃহ থাকিত। স্বামীর সহিত মনান্তর কিংবা কলহ হইলে রাণী মান-গৃহে গিয়া খিল আঁটিয়া দিতেন। তাহার পর অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া অনাহারে ধরণী-শয্যায় আলুলায়িত-কেশে শয়ন করিয়া থাকিতেন। রাজা আসিয়া অনেকক্ষণ সাধাসাধি করিলে পর দরজা খুলিয়া দিতেন, মান ভঞ্জন করিয়া রাজা নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন।

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীনের অন্দর-মহলে তেমন গোসা-ঘর ছিল না, আর থাকিলেও কে আসিয়া ফাতেমা বেগমকে সাধিত? মহলে প্রবেশ করিয়া মন্‌সব্‌দার সোজা খদিজা বেগমের ঘরে চলিয়া যাইতেন, অন্য কোন দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না।

নসরৎ ফাতেমার পুরাতন দাসী, সকল সময়ে বেগমের বড়-একটা খাতির করিত না। বিশেষ, ফাতেমা জানিতেন যে, সে তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসে ও তাঁহার মঙ্গল কামনা করে, এইজন্য তাহার অনেক কথা সহ্য করিতেন।

নসরৎ কহিল, "বিবি, সব তোমার দোষ।"

ফাতেমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, অনিদ্রায় চক্ষের কোলে কালি পড়িয়াছে। কহিলেন, "আমার কি দোষ?"

"ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কোন-কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই তুমি বিবাদ করিতে গেলে কেন? আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তোমায় বলিয়াছিলাম, তুমিও শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে। পুরুষ

মানুষ ত গরু নয়, যে, তাহার গলার দড়ী ধরিয়া যত-ইচ্ছা জোরে টানিবে। প্রেমের বাঁধন সরু সূতায়, জোরে টানিলেই ছিঁড়িয়া যায়।"

"আমি রাগ সাম্‌লাইতে পারি না।"

"এ ত রাগ নয়, ঈর্ষা। যাহাকে দেখ নাই, তার প্রতি ঈর্ষা কেমন? বাহিরের শত্রু ত বাহিরে রহিল, এখন ঘরের শত্রুকে কি করিবে?"

"কে জানিত যে, এমন কালসাপিনী ঘরে আছে!"

"ওটাও রাগের কথা। স্বামীর সোহাগ কে না চায়? এত দিন তোমার জিদ্ বশতঃ আর দুই বেগম চুপ করিয়া ছিল। এখন সুবিধা বুঝিয়া ছোট বেগম নিজের কাজ গুছাইয়াছে। দোষ আর কাহারও নয়, দোষ তোমার বুদ্ধির, আর তোমার কপালের।"

"এখন উপায়?"

"সে-ই আসল কথা। ছোট বেগমকে আমি চিনি, বড় চতুর, সহজে তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। প্রথম দেখিতে হইবে যে, মাছ গাঁথা আছে, না বঁড়্‌শী কাটিয়াছে; মন্‌সব্‌দারের মন একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, না শুধু খাপা হইয়াছে। যদি গাঁথা থাকে তবে সাবধানে খেলাইতে হইবে। যদি কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার গাঁথিতে হইবে। ছোট বেগমের সঙ্গে আগেকার মত হাসিয়া কথা কহিতে হইবে।"

"আমি কালামুখীর মুখ দেখিতে চাহি না।"

"ঐ ত বিবি, ঐ তোমার দোষ! রাগিয়া উঠিলে কিছুই হইবে না। এখানে লোহার তরবারিতে কাজ হইবে না; মিছরির ছুরী চাই। দিলের ভিতর যাহাই থাকুক, মুখে মধু চাই, নইলে কোন কাজই হইবে না।"

"আমি কি ছোট বিবির পায়ে ধরিয়া বলিব, আমার শওহরকে ফিরাইয়া দে ?"

"আবার রাগের কথা! তাহাই কি কেহ বলে? স্বামী যেমন তোমার, তেমনি ছোট বিবির ও বড় বিবির। মন্‌সব্‌দার যদি হুঁসিয়ার মরদ হইতেন, তাহা হইলে তোমাদের তিন জনকেই খুশ্‌ রাখিতেন, না হয় কিছু উনিশ-বিশ—কেহ-বা সাত আনা, কেহ-বা নয় আনা।"

"তবে কি খদিজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব ?"

"কেন কহিবে না? যখন মন্‌সব্‌দার উহার ঘরে যাইতেন না, তখন কি ছোট বিবি তোমার সহিত হাসিয়া কথা কহিত না? বরং বড় বেগম মুখ ভার করিয়া থাকিতেন। ছোট বেগম ভারি সেয়ানা, সকল দিক্‌ বজায় রাখিতে জানে।"

পুরুষ হইলে নসরৎ বাদশাহের উজীর হইত। তাহার কথা শুনিয়া ফাতেমা ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে মলেকা বেগম খুব খুশী। মন্‌সব্‌দার তাঁহার মহলে আসুন আর নাই আসুন, ফাতেমার মহল ত ছাড়িয়াছেন। দেমাকে ফাতেমা বেগমের মাটীতে পা পড়িত না, এখন কেমন হইয়াছে! মনের আনন্দ নিজের মনের ভিতর পূরিয়া রাখিতে না পারিয়া মলেকা বেগম খদিজার ঘরে গমন করিলেন। খদিজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া বসাইলেন।

মলেকা বলিলেন, "বহীন, আমি তোমাকে মোবারকবাদী দিতে আসিয়াছি।"

খদিজা নেকী সাজিলেন, "কিসের মোবারকবাদী, বেগম সাহেবা ?"

"এই যে মন্‌সব্‌দার তোমার ঘরে আসেন, আর ফাতেমার ঘরে যান না ; ফাতেমা যেন তাঁহাকে যাদু করিয়াছিল।"

খদিজা লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া ওড়নার খুঁট পাকাইতে লাগিলেন। "মন্‌সব্‌দারের উচিত ত সকলের ঘরে যাওয়া, তাঁহার কাছে ত সকলেই সমান।"

"তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল ? আমাকে ত তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন।"

"অমন কথা বলিও না। তোমার কথা ত প্রায় বলেন। তবে তুমি যদি রাগ অভিমান না করিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বল, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না।"

"এবার আসিলে বলিব না, কিন্তু আমার ঘরে কি আর আসিবেন ?"

"কেন যাইবেন না ? অবশ্য যাইবেন।"

সেই রাত্রে খদিজা জলালুদ্দীনকে বলিল, "তুমি বড় বিবির ঘরে কখন যাও না কেন ?"

"উহার মেজাজ বড় খারাপ, কেবল রাগের কথা। তাহা হইলে কি যাইতে ইচ্ছা করে ?"

"আর রাগের কথা বলিবেন না, তুমি কাল উঁহার ঘরে যাইও।"

বড় সতীন ছোট সতীনকে স্বামীর ঘরে দিয়া আসে, এখানে উল্টা রকম হইল। খদিজা উদ্যোগী হইয়া স্বামীকে মলেকার ঘরে পাঠাইয়া দিল। ফলে মলেকা ও খদিজায় খুব ভাব হইল।

ফাতেমার এ কথা জানিতে বিলম্ব হইল না। নসরতের উপদেশ-মত তিনি খদিজাকে কুবাক্য বলিতেন না, তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেন। একদিন হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আর বড় বেগম ত বেশ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছ !"

খদিজা হাসিয়া বলিল, "তাহাই ভাল, সব একেলা লইতে নাই।"

ফাতেমা বুঝিলেন, এ-কথা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হইল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। অন্য দুই এক কথার পর বলিলেন, "আমার উপর উঁহার রাগ কি কখন যাইবে না?"

"তাহা ত জানি না। আমাকে কিছু বলেন না।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ফাতেমার নামোল্লেখ হইলেই মন্‌সব্‌দার বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, খদিজাও তাঁহার নাম করিতেন না।

ফাতেমা যে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। খদিজা মুখে যতই মিষ্ট হউন, কাজে তাঁহার পথে কণ্টক হইয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হোলি

চৌধুরী বিহারীলালের গৃহে আজ হোলির ধূম। আবিরে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সকলের অঙ্গে বস্ত্রে আবির মাখা। কাহারও হাতে পিচ্‌কারী, কাহারও হাতে কুম্‌কুম্‌। বসন্ত-আগমনের উৎসব,—বাহিরে রং, ভিতরে রং। জমিদারের প্রাসাদ খুব গুল্‌জার।

মন্‌সব্‌দার আসিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান, এ-জন্য তাঁহার অঙ্গে বা বস্ত্রে কেহ রং দেয় নাই। হোলিতে নাচ-মোজরা হয়, জলালুদ্দীন তাহাই দেখিতে শুনিতে আসিয়াছিলেন। বিহারীলাল তাঁহাকে সমাদর করিয়া, গোলাপ-জল আতর সর্‌বত পান দিয়া মহ্‌ফিলে লইয়া গেলেন। তয়ফাওয়ালীরা সেইখানে। একজন হোলির কাফী গাহিতেছিল—

> ফাগুনকে দিন চার
> যো মাঙ্গো সো দিউঙ্গি ;
> হীরা ভি দিউঙ্গি, মোতি ভি দিউঙ্গি,
> দিউঙ্গি গলে-কা হার !

মন্‌সব্‌দার সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া বাইজীরা উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। মন্‌সব্‌দার পান চিবাইতে চিবাইতে তাহাদের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন। তাঁহার ধরণ-ধারণ দেখিয়া বাইজীরা বুঝিল, লোক রসিক বটে। তাহাদের মধ্যে যে সুন্দরী তাহাকে জলালুদ্দীন ডাকিলেন। সে তাঁহার কাছে আসিয়া ঘাগ্‌রা ছড়াইয়া বসিল। জলালুদ্দীন বলিলেন, "কুছ গাও, বিবি !"

বিবি মুচ্‌কিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া ধরিল,—

তেরো নয়নোনে জাদু ডারা !

মন্‌সব্‌দার তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "কিস্‌কি নয়ন ? তেরি ইয়া মেরা ?"

বিহারীলাল সেখানে ছিলেন না। মন্‌সব্‌দারকে বসাইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে থাকা আবশ্যক, অপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতে হইবে।

প্রথমে যাঁহারা আসিলেন সকলেই পরিচিত। বিহারীলাল ঔৎসুক্যের সহিত দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। দেখিলেন, চারিজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিতেছেন, অগ্রে একজন গম্ভীর পুরুষ।

বিহারীলাল কহিলেন, "রায় অযোধ্যানাথ ?"

অযোধ্যানাথ আর কেহ নহেন, গৌরীশঙ্কর। হাত বাড়াইয়া বিহারীলালের হাত ধরিলেন। কহিলেন, "চৌধুরী বিহারীলাল, আজ এই উৎসবের দিন আপনার সঙ্গে দেখা বড় আনন্দের কথা।"

"আপনার সঙ্গীদের পরিচয় দিন্।"

"বংশীধর, রঘুনন্দন, জয়ন্তপ্রসাদ।"

বয়সে জয়ন্তপ্রসাদ সকলের কনিষ্ঠ, কিন্তু দিব্য গোঁফ-দাড়ী, অথচ হাত ধরিবার সময় বিহারীলাল অনুভব করিলেন তাহার হাত বড় নরম। কোন অলস ধনবান্ যুবা হইবে !

পুণ্ডরীক যে পিছনে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এই নূতন অতিথিদিগকে সেও কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিল। জয়ন্তপ্রসাদকে দেখিয়া পুণ্ডরীক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

অযোধ্যানাথ মজলিসে না গিয়া বিহারীলালের বাড়ী দেখিতে

চাহিলেন। সেই অবসরে তিনি বিহারীলালকে নিজের সম্প্রদায়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ও বিহারীলাল মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। জয়ন্তপ্রসাদ পিছাইয়া পড়িলেন, তাঁহার পিছনে পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীককে কেহ দেখিতে পায় নাই। একটা প্রকোষ্ঠে জয়ন্তপ্রসাদ একা, আর সকলে আগাইয়া গিয়াছে, এমন সময় পুণ্ডরীক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন।

পুণ্ডরীক তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কহিল, "মহাশয়, আপনার এই দাড়ী কয় দিনের?"

জয়ন্তপ্রসাদ কহিলেন, "কে হে তুমি? পাগল না কি? কি বলিতেছ?"

পুণ্ডরীক কহিল, "বিহারীলাল দেখিতে পায় না বলিয়া কি আমিও অন্ধ? তোমাকে কি আমি কখন দেখি নাই? মাটীর ভিতর হইতে যখন বাহির করিয়াছি তখন এত আলোকে তোমায় চিনিতে পারিব না?"

জয়ন্তী চুপি চুপি কহিল, "চুপ কর, গোল করিও না। রায় অযোধ্যানাথ আমাদের গুরু, তাঁহার হুকুমে এই বেশে আসিয়াছি।"

"ছদ্মবেশে আসিতে বলা কেমন গুরুগিরি? তোমার মনে কি আছে কে জানে? যদি পুরুষ সাজিয়া, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারই কর? মহফিলে সরলা অবলা তয়ফাওয়ালীরা আছে, যদি মন্‌সব্‌দারের মত উহাদের সঙ্গে রসিকতাই আরম্ভ কর?"

জয়ন্তী ভয়ে অস্থির, এমন সময় আর সকলে ফিরিয়া আসিল। অমনি পুণ্ডরীক সরিয়া গেল।

কথা কহিতে কহিতে সকলে মহফিল-গৃহের দিকে চলিলেন।

জয়ন্তী—উপস্থিত জয়ন্তপ্রসাদ—গৌরীশঙ্করের কানে গোটা দুই কথা বলিল। তিনি মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিতে জয়ন্তী পিছাইয়া পড়িল, মহফিলে গেল না।

একটু পরে বিহারীলাল আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, যদি আর কেহ আসে। তাঁহার অঙ্গে সাদা মল্‌মলের মির্‌জাই; তাহাতে কেহ রং মাথায় নাই, কেবল টুপিতে অল্প একটু ফাগ। পুণ্ডরীক আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া অকারণে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন? কি হইয়াছে?"

"আপনার মনে হাসিতেছি।"

"তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু লোকে যে পাগল বলিবে। আর এখন লোকজন আসিতেছে যাইতেছে, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই?" কথার ভাবে বিহারীলাল যেন একটু রুষ্ট হইয়াছেন।

পুণ্ডরীকের হাসি থামিল, কিন্তু বিহারীলালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙ্গী মারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে ত লোকে পাগল বলিবে, আর তোমাকে অন্ধ বলিবে না?"

"আজ তোমার কি হইয়াছে, ভাঙ্গ বেশী খাইয়াছ?"

"হাঁ, সেইজন্য আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

"কি বলিবে, স্পষ্ট করিয়া বল না।"

"অস্পষ্ট কোন্ কথাটা? আমার কি কথা জড়াইতেছে? বোতল দুই সরাব পার করিয়াছি, না?"

"তুমি একটা কোন কথা বলিতে চাও। কি কথা?"

"তোমার চোকও বেশ পটলচেরা, আর আমার চোক দুটো কুৎকুতে। তবু আমি দেখিতে পাই, আর তুমি অন্ধ।"

"কেন ?"

"মেয়েমানুষের একহাত দাড়ী দেখিয়াছ ?"

"কি রকম তামাসা ?"

"যাহাকে দেখিবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াও সে যদি তোমার ঘরে পুরুষ সাজিয়া আসে তাহা হইলে তাহাকে চিনিতে পার না ?"

বিহারীলাল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইলেন। ধমনীতে যেন শোণিত-প্রবাহ বন্ধ হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মুখে রক্তের লেশ রহিল না। শুষ্ক মুখে ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "কোথায় ?"

"তুমি চক্ষু বুজিয়া অন্ধ হও, আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই।" এই বলিয়া পুণ্ডরীক রাগিয়া হন্ হন্ করিয়া আর-এক দিকে চলিয়া গেল।

বিহারীলাল দরজা ছাড়িয়া পাশের একটা ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাবিবার একটু সময় চাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,— "অন্ধ ? একবার কেন, শতবার অন্ধ ! মূর্খ পুণ্ডরীক দেখিবামাত্র চিনিল, আর আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া হস্ত ধারণ করিয়াও চিনিতে পারিলাম না ! কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব, ক্ষমা চাহিবার সুযোগই বা কেমন করিয়া হইবে ?"

বিহারীলাল উঠিয়া দূর হইতে দেখিলেন, মহফিলে জয়ন্তী নাই। তখন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একটা প্রকোষ্ঠে মুক্ত জানালার সম্মুখে জয়ন্তী বসিয়া আছে। বিহারীলাল তাহার নিকটে গিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। জয়ন্তী মাথা তুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে কেন ?"

"মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। পুণ্ডরীক তোমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে। আমি অন্ধ, চিনিতে পারি নাই, তুমি জয়ন্তী।"

জয়ন্তী অতি মধুর হাসিল,—বহুরূপী সাজিলে সকলে চিনিতে পারে না। আমারই লজ্জা পাইবার কথা, পুরুষের বেশে আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু এ বেশ আমি ইচ্ছা করিয়া ধারণ করি নাই, গুরুর আদেশ।

"অযোধ্যানাথ ?"

"উঁহার যথার্থ নাম গৌরীশঙ্কর। আপনি সকল কথা শুনিয়াছেন ?"

"কতক কতক শুনিয়াছি। তাঁহার দলভুক্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছি।"

"তাহা হইলে আপনিও আমাদের একজন।"

বিহারীলাল পাশে বসিয়া জয়ন্তীর হস্ত ধারণ করিলেন। জয়ন্তী হাত সরাইল না, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতেছিল।

জয়ন্তী কহিল "আমি বনে কখন বাস করিতাম না,—যাইতাম-আসিতাম মাত্র। গুরুদেব ও আর কয়েকজন কখন মন্দিরে, কখন গহ্বরে আসিতেন। আমি বনে দাঁড়াইয়া দেখিতাম, কোন অপর লোক আসে কি না। ইহার ভিতর আর কোন রহস্য নাই।"

অল্পকাল নীরব রহিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "আমি অন্য কথা ভাবিতেছিলাম। আমার হৃদয়ের ভাব তুমি কি বুঝিতে পার নাই ? তুমি যুবতী, এমন করিয়া কতদিন থাকিবে। আমার গৃহ শূন্য।"

জয়ন্তী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "ওরূপ কোন কথা শুনিতে আমার নিষেধ। যতদিন না কার্য্যসিদ্ধি হয়, ততদিন গৃহ-সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"এমন কতদিন যাইবে ?"

"জানি না।"

"যদি কোন নিষেধ না থাকিত, যদি তুমি মুক্ত থাকিতে, তাহা হইলেও কি আমার কথায় কর্ণপাত করিতে না ?"

"সে কথায় কোন ফল নাই।"

"আছে। বল, সময় আসিলে আমার কথা শুনিবে।"

"তখন সে-কথা হইবে, এখন তোমাকে কিছু বলিতে পারিব না।"

'আপনি' নয়, এবার 'তুমি'। বিহারীলালের হৃদয় আনন্দে আশায় পূর্ণ হইল।

বাহিরে কাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল। গৌরী-শঙ্করের কণ্ঠস্বর। বিহারীলাল ও জয়ন্তী ঘরের বাহিরে আসিলেন। দুই জন যুবাপুরুষ ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, ইহাতে দোষের কিছুই নাই।

গৌরীশঙ্করের মুখে নয়, চক্ষে একটু হাসি। সে হাসির অর্থ বুঝা ভার। কহিলেন, "কেমন জয়ন্তপ্রসাদ, চৌধুরী মহাশয়কে কোন গোপনীয় কথা বল নাই ত?"

"কোন বিষয়েই আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই।" কথার অর্থ গূঢ়, গৌরীশঙ্কর বুঝিলেন।

গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গীরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যর্থ মনস্কাম

বনবিহারিণী জয়ন্তীকে মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন ভুলিয়া যান নাই। খদিজা বেগমের প্রতি অনুগ্রহের কারণ ফাতেমার উপর রাগ; মলেকা বেগমের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কৃপার কারণ পূর্ব্বস্মৃতি ও খদিজার সুপারিস্। কিন্তু অজ্ঞাতনাম্নী অপরিচিতা বনবাসিনী সর্ব্বক্ষণ মন্‌সব্‌দারের স্মৃতিতে জাগিতেছিল। সেই সঙ্গে অনুচরদিগের অপমানে তাঁহার দারুণ ক্রোধ হইয়াছিল। একটা স্ত্রীলোক তাঁহার লোককে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়!

যে রাত্রে বিহারীলালের গৃহে হোলির উৎসব, তাহার পরদিন মন্‌সব্‌দার মকৃদুম শাহকে ডাকাইলেন। তাহাকে বলিলেন, "বিহারীলাল চৌধুরীর সঙ্গে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে?"

"হাঁ জনাব, খুব মনে পড়ে। বড়ি খুবসুরৎ অওরৎ, হুজুরের হবেলীর লায়েক।"

"আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল। রম্‌জান ও তিন জন সিপাহীকে তাহাকে আনিতে পাঠাই। তাহার লোকেরা আমার লোককে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।"

মকৃদুম শাহের চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল—"কি, এত বড় হিম্মত! এমন স্পর্দ্ধা!"

"তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বাঁদির বাঁদি করিব।"

"বেশক্ বেশক্, এই সাজাই ঠিক। হুকুম হয় ত আমি লস্কর লইয়া তাহাকে পাকড়াইয়া আনি।"

"না, বেশী লোকের কাজ নাই, বেকায়দা গোলমাল হইবে। আমি নিজে যাইব।"

মক্‌দুম শাহ মস্ত একটা সেলাম করিল, "তাহা হইলে ফৌজের কি প্রয়োজন? আপনি ইচ্ছা করিলে বনের বাঘ ধরিয়া আনিতে পারেন।"

"কাল কেহ উঠিবার আগে দশ জন লোক লইয়া আমার সঙ্গে যাইবে। এ কথা যেন প্রকাশ না পায়।"

মক্‌দুম জিভ কাটিল, "খোদাবন্দ্, এও কি কোন কথা! কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত জানিবে না।"

মক্‌দুম শাহ চলিয়া যাইলে রম্‌জানের ডাক পড়িল। সে মনে মনে সব পীরদের নাম করিতে করিতে আসিল।

মন্‌সব্‌দার চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "বেইমান, তোকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতে হইবে।"

"হুজুর, আমার কসুর?"

"তুই জানিস্ না তোর কসুর? সে-দিন মার খাইয়া কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া পলাইয়া আসিস্ নাই?"

"হুজুর, এক জন লোককে দশ জন লোক যদি পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া বাঁধিয়া মারে, তাহা হইলে কি তাহার অপরাধ?"

"তুই ভারি নালায়েক। আচ্ছা, এবার মাপ করিলাম। কাল সকালে সেই বদ্‌বখ্‌ৎ অওরৎকে ধরিয়া আনিতে আমি খোদ যাইব। তুই আর তোর সঙ্গীরা আমার সঙ্গে যাইবি।"

রম্‌জান তৎক্ষণাৎ মানৎ শিন্নী মনে মনে দ্বিগুণ করিয়া দিল।

মাটীতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, "বহুৎ খুব, হুজুর।" সে আর দাঁড়াইল না। তাহার ধারণা, বাদশাহেরা আর মন্‌সব্‌দারেরা অব্যবস্থিতচিত্ত—তাঁহাদের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।

রাত্রি থাকিতে দশ জন লোক সঙ্গে লইয়া মন্‌সব্‌দার নিঃশব্দে বাহির হইলেন। বনে প্রবেশ করিতে রৌদ্র উঠিল। সকলে চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল; বৃক্ষের মূলে গর্ত্ত সকলে দেখিল, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। সকলে বলিল, উহার ভিতর বাঘ আছে।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া মন্‌সব্‌দার ফিরিলেন। বনের বাহিরে পথের ধারে একটা ডোবায় পুণ্ডরীক মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রম্‌জানকে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিল, "শেখ সাহেব, কিছু শিকার মিলিল?"

রম্‌জান ঘাড় নাড়িল।

পুণ্ডরীক বলিল, "কোন শিকারটা বা উড়িয়া যায়, কোনটা বা গর্ত্তে প্রবেশ করে। গর্ত্তে খুঁজিয়াছিলে?"

"উহার ভিতর বাঘ আছে।"

"ঠিক কথা। বাঘটা কোন্ দিন তোর মন্‌সব্‌দারের ঘাড় মট্‌কাইয়া রাখিবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও সন্ন্যাসী

বাদশাহের আর ভিক্ষুকের ডাক যমরাজের কাছে ঠিক সমান পড়ে, কিছুমাত্র তফাৎ হয় না। প্রভেদ জীবনে, মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই। একটু বুঝিয়া দেখিলে জীবনেও কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু বাহ্য আড়ম্বরে।

বাদশাহের ডাক পড়িবার সময় আগাইয়া আসিতেছিল। তিনি নিজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে যাহারা আসিত তাহারাও বুঝিতে পারিত। বাদশাহ আর শয্যাত্যাগ করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময় কোরাণ শরীফ পড়িতেন, হাতে সকল সময় তস্‌বি থাকিত।

বাদশাহ রাজকার্য্যে আর অধিক মনোযোগ করিতেন না। উজীরকে বলিতেন, "আর ত আমার অধিক সময় নাই, খোদাতালার চিন্তা করিতে দাও। ইহার পর তোমাদের কি হইবে?"

"জাঁহাপনা, সে-কথা ভাবি না। আমারও ত সময় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন্ শাহজাদা তখ্‌তনশীন হইবেন, হুজুরের ইর্‌শাদ হওয়া উচিত।"

"কে আমার কথা শুনিবে? যদি আমি সামান্য নগরবাসী হইতাম, তাহা হইলে অন্তিমে কোন আদেশ করিলে পুত্রেরা আমার আদেশ পালন করিত, কিন্তু আমি যে বাদশাহ, মৃত্যুশয্যায় আমার আদেশ আমার মৃত্যুর পর আমার কোন্ সন্তান পালন করিবে? এ

কথা কেহ একবার ভাবে না! যতক্ষণ আমার নিশ্বাস বহিবে, এই বিরাট্ সাম্রাজ্যে আমার মুখের কথা, অঙ্গুলির ইঙ্গিত সেই মুহূর্ত্তে রক্ষিত হইবে। কাহার কয়টা মাথা আছে, যে, আমার ভ্রূভঙ্গ অবহেলা করে? আমার দুই পুত্র এখানে আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছে, কিন্তু আমি অনুমতি না দিলে সাধ্য কি যে নগরে প্রবেশ করে? আর আমি মরিলে? এই মৃত্যুশয্যায় যদি আমি কোন আদেশ করি আমার মৃত্যুর পর কে তাহা শুনিবে? যদি আজিমকে সিংহাসন ও রুস্তমকে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলের নিজামত দিয়া যাই, তাহা হইলে সে আদেশ কে পালন করিবে? দুই ভাইয়ে বিবাদ হইবেই, যে জিতিবে সেই তখৎ লইবে। যে হারিবে, সে হয়ত প্রাণ হারাইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে এমনি সদ্ভাব, পিতার মৃত্যুকালীন আদেশে এমনি আস্থা! বাদশাহী যে কি চীজ্ এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। চক্ষে মৃত্যুর অঙ্গুলি-স্পর্শে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি।"

আসন্ন মৃত্যুর সাক্ষাতে বাদশাহের চিন্তাশীলতা ও গভীর সত্য-ভাষিতা লক্ষ্য করিয়া উজীর আশ্চর্য্য হইলেন। এরূপ ক্ষমতাবান্ না হইলে কি যে-সে কোটি কোটি লোকের উপর একাধিপত্য করিতে পারে? একটু পরে উজীর বিনয়নম্র কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার তুল্য জ্ঞানী কে আছে? হুজুরের কাছে শাহজাদাদের তলব হইবে? আপনি কি তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহেন না?"

"আমি দেখিতে চাহিলে কি হইবে, তাহারা কি আমাকে দেখিতে চাহে? তাহারা আসিয়া দেখিবে আমি মরিয়াছি কি বাঁচিয়া আছি, আর তাহারা দেখিবে সিংহাসন। শয়নে স্বপনে তাহাদের সেই দিকেই দৃষ্টি থাকিবে। দুই ভ্রাতা দুই জনের মৃত্যু কামনা করিবে, আমার মৃত্যুকালে এই প্রাসাদেই চক্রান্ত করিবে। সৈন্য, প্রজা, রাজপুরুষ,

অমাত্য, ভৃত্য, খোজা, বেগম, বাঁদী সকলেই তাহাতে জড়িত হইবে। কে আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করিবে? আল্লাহ্‌তালার নিকট কে আমার জন্য দোয়া মানাইবে? এখন বরং ভাল, শান্তিতে মরিব। শাহজাদাদের আসিবার প্রয়োজন নাই।”

উজীর আর কি বলিবেন, অন্য দুই চার কথা কহিয়া উঠিয়া গেলেন। তাহার পর হাতিমের মাতা, জহানারা বেগম, বাদশাহ্‌কে দেখিতে আসিলেন। স্বামীর আদেশমত পালঙ্কে তাঁহার পাশে বসিলেন। বাদশাহ তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন, “তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি অধিক ভাবিও না।”

বেগমের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, “তোমার এমন অসুখ, আমরা ভাবিব না? ঈশ্বরের কৃপায় তুমি আরোগ্য হইয়া উঠিবে।”

বাদশাহ ক্ষীণ হাসি হাসিলেন, “ঈশ্বরের কৃপায় আমি জীবন নামক কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিব। জীবন শেষ হইলে আধি-ব্যাধি আর কিছুই থাকে না। সে কথা যাক্। তোমার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা নাই। হাতিম অথবা রুস্তম্ যেই বাদশাহ হউক তোমার সহিত কেহ অসদ্‌ব্যবহার করিবে না। তুমি সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, কাহারও সহিত তোমার বিবাদ নাই। তোমার জন্য আমি স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, তুমি সেইখানে থাকিবে। তোমার কোন কষ্ট হইবে না।”

“হাতিমকে তুমি ডাকাইয়া পাঠাও না কেন? সে ত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।”

“তাহা হইলে ঘরোয়া বিবাদ হইবে, অপর বেগমেরা গোল করিবেন। আর আমি যদি হাতিমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যাই, তাহা হইলে আমার সে-কথা থাকিবে না। ভাইয়ে

ভাইয়ে রাজ্যের জন্য যুদ্ধ-বিবাদ হইবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যেমন আছ সেইরূপ থাক, রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে লিপ্ত হইও না।"

বেগম ভাল মানুষ, ক্ষান্ত হইলেন।

বাদশাহের কাছে আর কেহ না থাকিলেই সিরাজী বেগম আসিতেন। তিনি আসিলে বাদশাহ বিচলিত হইতেন। বলিতেন, "তোমার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা। তুমি বুদ্ধিমতী, অনেক সময় অনেক বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ লইয়াছি। সকলেই জানে যে, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা, সকলেই তোমার মনরক্ষার চেষ্টা করে। আমার অবর্ত্তমানেও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না। কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

বেগম কাঁদিলেন না, কাঁদিবার দিন এখনও অনেক আছে। কহিলেন, "তুমি যেমন বলিবে সেইরূপ করিব।"

"আমার মৃত্যুর পর বিবাদ নিশ্চিত। তুমি কাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে?"

বেগম কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

বাদশাহ সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখন চুপ করিয়া থাকিবার সময় নয়। আমার সময় অল্প। হয়ত তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি।"

অগত্যা বেগম কহিলেন, "আমার ত পুত্র নাই, রুস্তমের মা নাই। আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসি। আমার বিবেচনায় সেই সিংহাসনের উপযুক্ত।"

ক্ষণকাল বাদশাহ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রশংসার যোগ্য। তোমার সহিত আমার এক-মত।

তুমি যে রুস্তমের পক্ষে, একথা তাহাকে জানাইতে বিলম্ব করিও না।"

"তাহাকে জানাইয়াছি।"

বেগমের বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরতা দুই সমান বুঝিতে পারিয়া বাদশাহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইলেন। বেগম তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দিন দুই পরে বাদশাহের ভৃত্য তাঁহাকে নিদর্শন অঙ্গুরী আনিয়া দিল। বাদশাহ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "যিনি এই অঙ্গুরী দিয়াছেন তাঁহাকে ডাক।"

গৌরীশঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিলে বাদশাহ তাঁহাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। কহিলেন, "আমার সময় নিকট। আপনার আশায় ছিলাম। আমি জানিতাম, আপনার সহিত আর-একবার সাক্ষাৎ হইবে।"

"সমস্ত জানিয়াই আমি আসিয়াছি।"

"কি সংবাদ ?"

"সংবাদ আশানুরূপ। দুই শাহাজাদাই রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছেন।"

"বিনা আদেশে ?"

"আপনার আদেশ দিবার ক্ষমতা কতক্ষণ থাকিবে ? আর আদেশ পাইলেও তাঁহারা ফিরিবেন না। আপনার অবস্থা তাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন। তাঁহারা আদেশ পালন না করিলে তাহার কোন ব্যবস্থা করিবার আপনার সময় হইবে না।"

"আমি থাকিতে তাহারা নগরে প্রবেশ করিবে না ত ?"

"সে আশঙ্কা নাই।"

"দুই জনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

"না, শাহ্‌জাদা হাতিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই।"

"রুস্তমের মনোভাব বুঝিলেন ?"

"তিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসন করিবেন।"

"আর কিছু ?"

"আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখিবেন।"

"আপনাদের বলের পরীক্ষা হইয়াছিল ?"

"হইয়াছিল। শাহ্‌জাদার সৈন্য একদিন অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

"আপনার কথায় অনেক নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আমাদের এখানে আর দেখা হইবে না ?"

"না।"

বাদশাহ্ হাত বাড়াইয়া দিলেন। গৌরীশঙ্কর দুই হস্তে বাদশাহের হাত ধরিলেন।

তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া বাদশাহ্ গৌরীশঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন, "খোদা হাফিজ !"

"শিবাস্তে পন্থানঃ।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

লূতাতন্তু

রাজধানীর পূর্ব্বে শাহজাদা রুস্তম্, দক্ষিণে শাহজাদা হাতিম। উভয়ের লক্ষ্য রাজধানীর দিকে, দুই জনে দুই জনের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। শঙ্কাশূন্য পশুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্র যেমন নিঃশব্দে অপেক্ষা করে, দুই জনে রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য সেইরূপ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু দুই জনের কেহই আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিলেন না। মৃত্যু আসন্ন হইলেও বাদশাহ বর্ত্তমান, কাহার সাধ্য তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করে?

দুই জনে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল চারিদিকে বিস্তার করিতেছিলেন। অহোরাত্র গুপ্তচরের যাতায়াত, প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত মন্ত্রণা, সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা উত্তেজনা দান। মাকড়সা যেরূপ দ্রুত জাল রচনা করে, রাজপুত্রেরা সেইরূপ করিতেছিলেন; কিন্তু সে জালের মধ্যস্থলে বসিয়া নিয়তি। ভবিতব্যের তাড়নায় দুই জনে চালিত হইতেছিলেন।

গৌরীশঙ্কর শাহজাদা রুস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, "বাদশাহকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার সহিত আর-একবার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

"কেমন দেখিলেন?"

"আয়ু পূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু বাদশাহের মেধা কিছু মাত্র ক্ষীণ হয় নাই, মনের দৃঢ়তাও হ্রাস হয় নাই।"

"আমাদের বিষয়ে কিছু কথা হইল ? সিংহাসনের সম্বন্ধে তাঁহার কি অভিলাষ ?"

"তিনি কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন না। তিনি জানেন, তাঁহার কথা রক্ষিত হইবে না। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। স্থির চিত্তে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"আমার কর্ত্তব্য পিতার নিকটে এমন সময় উপস্থিত থাকা, কিন্তু আদেশ না পাইলে কেমন করিয়া যাই ?"

এমন সময় সিরাজী বেগমের মহল হইতে খোজা আসিল। সে আসিয়া যেরূপ বাদশাহকে সেলাম করিতে হয়, সেই রকম করিয়া তিন পদ পিছু হটিয়া শাহজাদাকে কুর্ণীশ করিল।

শাহজাদা কহিলেন, "আমি ত বাদশাহ নই।"

খোজা কহিল, "জাঁহাপনা, আপনার বাদশাহ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সিরাজী বেগম সাহেবা আপনাকে বহুত বহুত দোয়া দিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজধানীর সকলে আপনার পক্ষে। তিনি বাদশাহকেও রাজি করিয়াছেন, কিন্তু সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে ও বাদশাহের অমতে এখন আপনাকে সহরের ভিতর যাইতে পরামর্শ দেন না।"

রুস্তম্ কহিলেন, "অম্মা বেগম সাহেবার এ উপকার আমি ভুলিব না। যদি আমি তখৎ পাই তাহা হইলে তাঁহার গৌরব বাড়িবে, খর্ব্ব হইবে না।"

শাহজাদা হাতিমের শিবিরেও অনবরত লোক আসিতেছে-যাইতেছে। তিনি লঘুচেতা, কখন বলবতী আশায় বলীয়ান্, কখন নিরাশাসাগরে মগ্ন। মূঢ় মোসাহেবেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে।

একজন বলিল, "শাহজাদা, আপনি বাদশাহের বড় পুত্র, সকল

বিষয়ে আপনি বড়। শাহজাদা রুস্তম্ কেমন করিয়া আপনার বরাবরি করিবেন ?”

দ্বিতীয়। “হাঁ, তাঁহার কিছু সৈন্য আছে বটে, কিন্তু আমাদের লস্করের সম্মুখে কত ক্ষণ দাঁড়াইবে ? তিনি সন্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাকে একটা সুবা দিলেই হইবে।”

তৃতীয়। “তাহাই বা কেন ? শাহজাদা তখ্‌ৎনশীন হইলে সে পরের কথা। তিনি বড় ভাইয়ের হুকুম মানিলে ভবিষ্যতে তাঁহারই লাভ।”

চতুর্থ। “আমি ত সত্য কথা জানি। অমন কণ্টক পথে না রাখাই ভাল।”

কথাটা স্পষ্ট করিবার জন্য সে এরূপ ভাবে হাতের ভঙ্গী করিল যে, যেন হাতে মাথা কাটা তাহার নিত্যকর্ম্ম।

সেনাপতি আসিয়া কহিলেন, “শাহজাদা, আপনার সহিত একান্তে কিছু কথা আছে।”

মোসাহেবেরা চটিয়া লাল। “একান্তে আবার কি কথা ? শাহজাদা আমাদের নিকট হইতে কিছু গোপন করেন না।”

শাহজাদা সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তোমরা উঠিয়া যাও। সেনাপতির কথা হইয়া গেলে আসিও।”

তাহারা রাগিয়া উঠিয়া গেল।

সেনাপতি কহিলেন, “শাহজাদা, খবর খারাপ। শাহজাদা রুস্তমের বল দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার লোকেরা দেশ-দেশান্তে ঘুরিতেছে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁহার শ্রান্তি নাই, আলস্য নাই, নিদ্রা নাই—কখন সৈন্যদের শিবিরে, কখন বড় বড় তালুকদারের সঙ্গে, কখন সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে অত্যন্ত সরলভাবে আলাপ করেন। সকল শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার গুণে মোহিত হইয়াছে।”

"কেন, আমি ত খুব উত্তেজনাপূর্ণ উৎসাহ, আদেশ সৈন্যদের দিয়া থাকি, আর সকলের সহিত ত দেখা করিতে রাজি আছি।"

"শাহজাদা! গুস্তাকি মাফ, লেখা হুকুমে আর নিজের মুখের কথায় অনেক প্রভেদ। আর লোকের অপেক্ষায় থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে, আপনাকে নিজে গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে হইবে, কেন না আপনি তাহাদের সাহায্য-প্রার্থী। আপনি সৈন্যশিবিরে যান না, কোন গ্রামেও প্রবেশ করেন না।"

শাহজাদা অঙ্গুলীর নখ খুঁটিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে?"

"আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি, এখন আদব-কায়দার সময় নহে। সিংহাসন দখল করা কি ছেলেখেলা? আপনি ত হারাইতে বসিয়াছেন।"

"আমি বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন ত আমারই প্রাপ্য।"

"আপনাদের কিংবা অন্য বংশে কি এরূপ দেখিয়াছেন? যে বলবান্, বুদ্ধিমান্, চতুর, কুশলী, আলস্যহীন, রাজ্য তাহার। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আপনাকে কি করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে এই অলস অকর্ম্মণ্য মোসাহেবের দল বিদায় করিতে হইবে। আপনার আমোদপ্রমোদ অথবা বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। তাহার পর আপনাকে সকল কর্ম্মে উদ্‌যোগী হইতে হইবে, সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। বাদশাহ কখন্ আছেন, কখন্ নাই, তাহার কোন স্থিরতা নাই। রাজধানীতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। শাহজাদা, আমরা আপনার হিতকামনা করি, এ সময় কোন কথা গোপন করিতে পারি না!"

শাহজাদা কহিলেন, "তোমার কথা স্বীকার করিলাম। চল সৈন্য-শিবিরে যাই।"

ঘটনাজাল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। কেহ হাতিমের পক্ষে, কেহ রুস্তমের পক্ষে। ঘরে ঘরে, সকল দেশে বাদশাহের আসন্ন মৃত্যুর কথা আলোচিত হইতেছিল। মক্ষিকার মত সকলে লূতাতন্তুতে জড়িত হইতেছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূরপুরে

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীনকে পূর্ব্ব প্রদেশের স্থবাদার গোপনে পত্র লিখিয়াছেন যে, বাদশাহ্ মৃত্যুশয্যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর দুই শাহ্‌জাদার বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, অতএব এই বেলা হইতে এক জনের পক্ষ সমর্থন না করিলে ভবিষ্যতে বিপদ্ ঘটিবে। তাঁহার মতে শাহ্‌জাদা রুস্তম্‌ই সিংহাসন অধিকার করিবেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতা ও বুদ্ধি অধিক, শাহজাদা হাতিম তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিবেন না।

এখন, দিল্লীতে যাহার ঘরে জলালুদ্দীন মানুষ হইয়াছিলেন সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা শাহজাদা হাতিমের মাতার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। সেইজন্য মন্‌সব্‌দার কতকটা হাতিমের পক্ষপাতী। উপরন্তু শাহ্‌জাদা হাতিমের গুপ্তচর আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, আপনি শাহজাদাকে সাহায্য করুন, তিনি বাদশাহ্ হইলে আপনাকে একটা স্থবা দেওয়া হইবে। স্থবাদারের পত্র পাইয়া মন্‌সব্‌দার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বিহারীলালেরও নিকট পত্র আসিল। স্বাক্ষর নাই, কিন্তু বিহারীলাল বুঝিতে পারিলেন যে, পত্র গৌরীশঙ্করের আদেশে লিখিত। তাহাতেও সংবাদ, মন্‌সব্‌দারের পত্রের ন্যায়, কিন্তু পরামর্শ অন্য রকম। পত্রলেখকের মতে শাহ্‌জাদা রুস্তম্ সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। পত্রের শেষাংশ এইরূপ—'এখন স্থবাদার মন্‌সব্‌দার সকলেই মুসলমান। শাহজাদা রুস্তম্ বাদ্‌শাহ্ হইলে উপযুক্ত হিন্দুরাও

এই-সকল পদে নিযুক্ত হইবে। আপনার মত উপযুক্ত লোক কম আছে। আপনি কি কেবল জমিদারী করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন? দেশের লোকের কাজ করিতে চাহেন না, রাজপুরুষ হইয়া সুশাসন করিতে চাহেন না? আপনি শাহজাদা রুস্তমের পক্ষে হইলেই উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন। আপাততঃ দুইহাজারীর ফর্ম্মান যাইতেছে, এ দুই হাজার সৈন্য আপনি নিজে সংগ্রহ করিবেন। রায় অযোধ্যা-নাথের সহিত যাঁহারা হোলির রাত্রে আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। জয়ন্তপ্রসাদ—তাঁহাকে কি আর কখন অন্য বেশে দেখিয়াছিলেন?—এ কাজে সামিল আছেন।'

এ কেমন প্রলোভন? জয়ন্তীর সহিত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অপেক্ষা বিহারীলালের পক্ষে আর কি সুখের হইতে পারে? গৌরীশঙ্করের সঙ্গীরা কোথায়? বিহারীলাল এই সকল কথা ভাবিতে-ছেন, এমন সময় গৌরীশঙ্কর যাঁহাকে রঘুনন্দন বলিয়া বিহারীলালের সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন তিনি আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গুরুদেবের পত্র পাইয়াছেন?"

"পাইয়াছি।"

"আপনার কি মত?"

"আমি ত ইতিপূর্ব্বেই আপনাদের সহিত যোগ দিয়াছি। এখন শাহজাদার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।"

"শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আজ একবার আমাদের শিবিরে আসিবেন?"

"আপনাদের শিবির?"

"বিচিত্র কি! জয়ন্তপ্রসাদকেও জয়ন্তীর রূপে দেখিতে পাইবেন।

যদি স্ত্রীলোক পুরুষ সাজিতে পারে, তাহা হইলে উদাসী ফকীর সিপাহী সাজিবে না কেন?"

বিহারীলাল উঠিয়া কহিলেন, "আপনার সঙ্গে যাইব?"

হাস্যমুখে রঘুনন্দন কহিলেন, "না, সন্ধ্যার পর আসিলেই ভাল হয়। অরণ্যের বাহিরে মন্দিরের নিকট আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন।"

রঘুনন্দন চলিয়া গেলেন। দিবাভাগের অবশিষ্ট বিহারীলালের পক্ষে অস্থিরতায় কাটিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পুণ্ডরীককে লইয়া বনের দিকে চলিলেন।

পুণ্ডরীক কহিল, "আবার!"

"দোষ কি?"

"ঐ বনই ত সব নষ্টের গোড়া!"

"কি রকম?"

"কখন বনদেবী, কখন বহুরূপী, কখন বাঘের বাসা,—সবই ত ঐ বনের ভিতর আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি-বা বনের হাঙ্গামা ফুরাইল।"

"সে কথা ঠিক, বনে আর কিছু নাই।"

"তবে আবার কেন সেখানে?"

"এবার বনে নয়, বনের বাহিরে।"

"আঃ, বাঁচা গেল! দিনের বেলা বাঘ-ভাল্লুককে ডরাই না, কিন্তু রাত্রে? দানো দৈত্য ব্রহ্মদৈত্য কি আছে, কে জানে? রাম, রাম!"

বিহারীলাল হাসিয়া ফেলিলেন, "পুণ্ডরীক, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার ভয় নাই, ভূত-প্রেতকেও নয়।"

"কে বলিল? দেখাও দেখি আমাকে একটা ভূত, দেখ ত আমার দাঁতকপাটি লাগে কি না?"

"ভূত দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ত ভয়, দেখিলে আর কে ভয় পায় ?"

পুণ্ডরীক অন্য কথা পাড়িল। "আচ্ছা লালজী, তুমি যেখানে যাইতেছ, সেখানে লড়াই-টড়াইয়ের কিছু সুবিধা আছে ? একটা নাকি ভারি লড়াই বাধিবে।"

"সে কথা ঠিক। তোমারও লড়াই করিবার সুযোগ হইতে পারে। হয় ত তুমি অনেক সিপাহীর সর্দ্দার হইবে।"

"বল কি, লালজী ! এমন কথা যে কখন শুনি নাই।" পুণ্ডরীক আহ্লাদে উরু চাপ্‌ড়াইতে লাগিল।

বিহারীলাল গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "পুণ্ডরীক, সম্মুখে কিছু দেখিতে পাইতেছ ?"

"বাস্ রে, কন্ধকাটা ভূত না কি ? না, এ কি এ ? এ যে তাঁবু ! এক, দুই, তিন, দশ, বিশ, পঞ্চাশ ! এ যে লস্কর, ফৌজ, অক্ষৌহিণী ! হুঁ, এবার আর কোন গলদ নাই, গল্প নয়, তোফা টাট্‌কা কট্‌কটে লড়াই ! যুদ্ধং দেহি ! যুদ্ধং দেহি !"

"আরে হনূমান্, চুপ কর, নইলে বিনা যুদ্ধেই একটা গুলি খাইবে, আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত একেবারে এড়াইবে।"

প্রহরী হাঁকিল, "কে ?"

"চৌধুরী বিহারীলাল।"

সম্মুখের শিবির হইতে তিন চারি জন বাহির হইয়া আসিলেন —রঘুনন্দন, বংশীধর, আরও কয়েক জন। তাঁহারা বিহারীলালকে অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। বিহারীলালের চক্ষু তাঁহা-দিগকে অতিক্রম করিয়া শিবিরের দিকে গেল।

তাঁবুর দ্বারে দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট রমণীমূর্ত্তি। জয়ন্তী !

তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া বিহারীলাল দেখিলেন, জয়ন্তী নাই !

জয়ন্তী তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গিয়া একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইল। বিড়াল যদি বাঘের মাসী হয়, তাহা হইলে পুণ্ডরীক তাহার খুড়তুত-ভাই হইবে, যেমন আলোকে তেমনি অন্ধকারে দেখিতে পায়। সে গিয়া জয়ন্তীর পাশে হাজির। সে জয়ন্তীকে অত সমীহা করিত, কিন্তু সেই হোলির রাত্রির বহুরূপী মূর্ত্তি দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাহ্যই করিত না; বলিল, "দাড়ী কি ধোপার বাড়ী গিয়াছে? তা আজকাল অমন হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ধোপার বাড়ী দেওয়া ভাল।"

জয়ন্তী কপট রাগ করিয়া কহিল, "তোমার দিন দিন স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।"

"দিন দিন? কয় দিন? আজ, কাল, পরশু? সে—ই রাত আর এ—ই দিন! দিন দিন কেমন করিয়া হইল?"

জয়ন্তী হাসিতে লাগিল।

তাঁবুর ভিতরে বসিয়া বিহারীলাল বলিতেছিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাকে যে ভার অর্পিত হইয়াছে আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। কল্য হইতে আরম্ভ করিব। এক পক্ষের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্য আমার অধীনে প্রস্তুত থাকিবে। আমাকে আর কি করিতে হইবে?"

রঘুনন্দন কহিলেন, "দুই এক দিনে জানিতে পারিবেন। সম্প্রতি এই মহকুমা আপনার অধীন হইবে, তাহার পর আবশ্যক হয় আপনাকে সসৈন্যে শাহজাদার সহিত যোগদান করিতে হইবে।"

"আদেশ প্রাপ্ত হইলে আমি সেই দণ্ডে যাত্রা করিব। আপনাদের কি অভিপ্রায়?"

"আমরাও আপনার সঙ্গে থাকিব। আপনি সেনাপতি।"

"আমি অযোগ্য, যুদ্ধের আমার কি অভিজ্ঞতা আছে?"

"সেকথা যাঁহারা আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন।"

বিহারীলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের সঙ্গে আর-একজন হোলির সময় গিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। জয়ন্তপ্রসাদ কোথায়?"

অল্প হাসিয়া রঘুনন্দন কহিলেন, "একটু মুস্কিল হইয়াছে। তখন তিনি পুরুষ ছিলেন, এখন স্ত্রীলোক।"

"সেকথা আমি জানি। পুরুষ সাজিবার পূর্বে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।"

"তবে এদিকে আসুন।"

রঘুনন্দন পথ দেখাইয়া তাঁবুর বাহিরে গেলেন। বাহিরে অল্প অন্ধকারে জয়ন্তী দাঁড়াইয়া ছিল। বিহারীলাল দ্রুতপদে গিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। দুই জনে কথা কহিতে কহিতে শিবিরের বাহিরে চলিলেন। রঘুনন্দন পিছাইয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীক কোথায় গেল দেখা গেল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্নালোকে

শিবির একটা উপবনের মধ্যে। সেইজন্য সেখানে অল্প অন্ধকার। বাহিরে জ্যোৎস্না, বড় মধুর, বড় মায়াময়ী। বাতাস থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বহিতেছে। শিবিরের শব্দ স্তব্ধ হইয়া আসিল। কখন কোন পক্ষীর রব, আবার চারিদিক্ শব্দশূন্য। অদূরে অন্ধকার অরণ্য।

পূর্ব্বদৃষ্ট মন্দির সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল জয়ন্তীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। যেখানে জয়ন্তী অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল, বিহারীলাল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হৃদয়ের আবেগপূর্ণ স্বরে বিহারীলাল ডাকিলেন, "জয়ন্তী!"

জয়ন্তী নিরুত্তর।

"মনে পড়ে এইখানে তুমি অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলে?"

"পড়ে।"

"সেই প্রথম হস্তে হস্তে স্পর্শ?"

"পড়ে।"

"দোলের রাত্রি?"

"মনে পড়ে।"

"পুরুষ সাজিয়াছিলে কেন?"

"গৌরীশঙ্করের আদেশ। এ বেশে যাইতে পাইতাম না।"

"তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা আমাদের দেখা হয়?"

"কি জানি !"

"গৌরীশঙ্কর তোমার কে ?"

"তিনি আমার পিতৃতুল্য। আমার পিতা-মাতা নাই, তিনি আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। এই লোকসেবা-ব্রতেও তিনি আমাকে দীক্ষিত করেন।"

"আমি তোমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করি নাই, আজ রঘুনন্দন আর সকলে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে আমার সঙ্গে আসিতে দিলেন। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের মিলনে কাহারও আপত্তি নাই।"

জয়ন্তী আবার নিরুত্তর।

দুই জনে দূর্ব্বাসনে উপবেশন করিলেন। এমন আসন কোথায় আছে ?

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই কথা !

"জয়ন্তী, মনে পড়ে ?"

"পড়ে !"

"সেই বনে প্রথমে দেখা, সেই বনদেবীর আবির্ভাব ?"

"পড়ে।"

"আমার হৃদয় তখনই চঞ্চল হইয়াছিল। আর তোমার ?"

জয়ন্তীর মস্তক নত হইল— নত হইয়া, কোন্ অপূর্ব্ব চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়া, বিহারীলালের স্কন্ধে রক্ষিত হইল। ক্ষুদ্র, তপ্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বিহারীলালের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল, "আমারও।"

"মন্‌সব্‌দার তোমাকে তাহার বেগম করিতে চাহিয়াছিল ?"

"তাহার কথায় কাজ নাই।"

"তুমি আমারই।"

"আমি তোমারই।"

বিহারীলালের স্কন্ধে মস্তকের ভার গুরু হইল।

"জীবনে মরণে, জন্মে জন্মে, যুগে যুগে তুমি আমার।"

জয়ন্তীর বলয়িত বাহু-লতা বিহারীলালের কণ্ঠে লগ্ন হইল। কম্পিত কোমল কণ্ঠে উত্তর আসিল, "অনাদি অনন্ত কালে, জীবনে মরণে, জাগরণে শয়নে, সুখে দুঃখে, ভোগে ত্যাগে, আমি তোমার! বল তুমি আমার!"

চির-পুরাতন, চির-নূতন এই প্রথম প্রণয়ের লীলা! সেই একই কথা শত শত বার, সেই কম্পিত করে করে স্পর্শন, সেই ঢল-ঢল সিক্ত নয়নে নয়নে মিলন! সেই হৃদয়ের আবেগ, সেই গুরু গুরু দুরু দুরু থর থর বক্ষ, সেই আশা, সেই ভয়, সেই মিলনের অতৃপ্তি! পুরুষ ও রমণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! হৃদয়ের সকল তন্ত্রী একত্রে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, নিখিল বিশ্বে সপ্ত স্বরে প্রেমসঙ্গীত ভাসিয়া বেড়ায়! এক মুহূর্ত্তে বিশ্বচরাচরের মূর্ত্তি নূতন হইয়া যায়, উদ্বেলিত প্রেমতরঙ্গ সর্ব্বত্র আঘাত করে! হৃদয় হইতে অঞ্জলিপূর্ণ প্রেম দিকে দিকে বিতরণ করে, এক নিমেষে কাঙ্গাল কুবের হয়! এই নরনারীর যুগ্ম রূপ, দুইয়ে এক, একাধারে হরগৌরী! প্রেমের এই আলাপ, মিলনের এই সম্ভাষণ, বহু পুরাতন, আবার নিত্য-নূতন!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকের পদোন্নতি

পর দিন প্রভাতে চৌধুরীদের সিংহদ্বারে নহবত বাজিল না, তাহার বদলে ডঙ্কা বাজিল। সেই দুন্দুভি-নিনাদে গ্রামের লোক চমকিয়া উঠিল। কত বৎসর, হয়ত দুই এক পুরুষ, কেহ এ শব্দ শোনে নাই। গুড়ু গুড়ু গুম্, গুড়ু গুড়ু গুম্! মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এ শব্দের অর্থ কি? পূর্ব্বে না শুনিলেও তাহার অর্থ সকলে বুঝিতে পারিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, জমীদারবাড়ীতে নাগরা বাজে কেন?"

উত্তর, "কেন আবার জানিস্‌নে? যুদ্ধ হবে। ঘরে কি অস্ত্র-শস্ত্র আছে, বাহির কর্।"

"যুদ্ধ ত বাদশাহের বেটারা করিবে, তার এখানে কি?".

"আরে পণ্ডিতের পুত, মাঝ দরিয়ায় ঢেউ উঠ্‌লে ডাঙ্গায় লাগে কেন? আর কিনারায় কাছী-বাঁধা ডিঙ্গীই বা ঝপাস্ ঝপাস্ ক'রে আছাড় খায় কেন? এখন বুঝ্‌লে ঢেকিরাম? বাদশাহী দরিয়া বড় দরিয়া! সেখানে উঠ্‌লে তুফান দেশটা হবে খান খান। কেউ রক্ষা পাবে না।"

"তাই ত! এখন উপায়?"

উপায় যা পূর্ব্বপুরুষে কর্‌ত, তাই। লাঠি সোঁটা, বর্শা, তলওয়ার —যা আছে নিয়ে আয়।"

চারিদিকে ভারি হৈচৈ পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত জমিদারীতে খবর হইয়া গেল। যে যাহা অস্ত্র পাইল লইয়া জমীদার-বাড়ী ছুটিল। 'যায় প্রাণ যাবে লড়াইয়ে, তা বলে' কি পুরুষপদ্ধতি

ভুল্‌বে'—মুখে মুখে এই কথা। বিহারীলালের বাড়ীর সম্মুখের বৃহৎ মাঠ ভরিয়া গেল। নায়েব গোমস্তা রসদের সরঞ্জাম করিতে ছুটিল, যত গ্রামের বেনের দোকান খালি হইতে লাগিল।

বিহারীলাল মাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া প্রজাদিগকে বলিলেন, "তাঁবু আসিয়া পড়িল, অস্ত্র শস্ত্রও আসিতেছে। যুদ্ধ যে হইবেই, এমন কোন কথা নাই, তবে প্রস্তুত হওয়া ভাল। আমি তোমাদিগকে শিখাইব।"

"লড়াই হয় হবে হুজুর, আমরা কি কেউ পিছ্‌-পা? আর মরণ ত এক দিন আছেই, কি বল পরামাণিক ভায়া?"

পুণ্ডরীক বিহারীলালের পিছনে পিছনে, দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। মাঠ হইতে ফিরিতে বিহারীলাল তাহাকে কহিলেন, "পুণ্ডরীক!"

"হুজুর!" পুণ্ডরীকের রসিকতার কৌটাটা হঠাৎ খালি হইয়া গিয়াছিল।

"যদি যুদ্ধ হয় তাহা হইলে তোমাকেও যাইতে হইবে।"

"যেখানে তুমি সেখানে আমি।" পুণ্ডরীকের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিতেছিল। "আমার কি ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে যে আমি মরিলে কাঁদিবে?"

"তুমি উত্তম সিপাহী হইবে। যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইলে আমার নীচে একটা সেনাপতির মত হইতে পার।"

"আমি নায়েব সেনাপতি—আমি!" পুণ্ডরীকের বুক ফুলিয়া মাছের পট্‌কার মত হইল।

"এখনি নয়। তবে আমার সঙ্গে তুমি কতক কতক সৈন্যশিক্ষার ভার লইতে পার।"

পুণ্ডরীক ভারি খুসী। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, বিহারীলালের পরেই সে ছোট সেনাপতি হইবে। বোঝা বোঝা অস্ত্র যখন আসিয়া পড়িল তখন তাহার ব্যস্ততা দেখে কে! বিহারীলাল যদি অস্ত্র শিক্ষা দেন এক ঘণ্টা, ত সে শিখায় আড়াই ঘণ্টা। যুদ্ধ ত দূরের কথা, পুণ্ডরীকের শিক্ষার চোটে গরিব প্রজাদের প্রাণ যায়! তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন, তাহার বিকট মুখভঙ্গী, তাহার আস্ফালন দেখিয়া শুনিয়া নূতন সৈন্যদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। আবার যখন তাহাদিগকে শিখাইবার জন্য পুণ্ডরীক তলওয়ার খেলা করে, বিদ্যুতের মত অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন চাষাভূষা সৈন্যেরা ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া বিশ হাত দূরে পলায়ন করে। তাহার হুঙ্কারে তাহাদের প্লীহা চমকিয়া উঠে। এক দিন হঠাৎ বিহারীলাল আসিয়া দেখেন পুণ্ডরীক বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া তরবারি-হস্তে লাফাইতেছে। তাঁহাকে সে দেখিতেই পায় নাই। বিহারীলাল কহিলেন, "পুণ্ডরীক, এ কি?"

পুণ্ডরীক থমকিয়া দাঁড়াইল। লজ্জিত হইয়া অসি নামাইল। কহিল, "আজ্ঞে, তরবারি যুদ্ধ শিখাইতেছি।"

"প্রথমে ত শায়েস্তা কর, তার পর যুদ্ধ। আর সৈন্যের মাঝখানে কি তরবারি খেলা করা যায়?"

বিহারীলাল সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একত্রে অগ্রসর হইতে, পিছু হটিতে, ব্যূহ রচনা করিতে শিখাইলেন। সেদিনকার মত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পুণ্ডরীককে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পথে তাহাকে বলিলেন, "আমি যেমন শিখাই সেইরূপ শিখাইবে। সৈন্যদিগকে তাহাদের অসাধ্য অস্ত্র-কৌশল শিখাইবার চেষ্টা করিও না। প্রথম হইতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইলে তাহারা কিছুই পারিবে না।"

পুণ্ডরীকের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। কহিল, "এবার হইতে ঠিক তোমার মত শিখাইব।"

বিহারীলাল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেছেন এ কথা মনসব্‌দারের জানিতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমে মকদুম শাহকে পাঠাইলেন। শাহজী আসিয়া বিহারীলালকে বলিলেন, "চৌধুরী সাহেব, আপনি এ কি করিতেছেন?"

বিহারীলালের পূর্ব্বের সে অলস ভাব, আলস্যজড়িত কথা একেবারেই নাই। এখন কর্ম্মীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট কথা। কহিলেন, "যাহা বলিবার স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

"আপনি কাহার আদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন? ইহা ত বিদ্রোহের ব্যাপার।"

"আমি কি গোপনে কিছু করিতেছি? আপনি কি এ কথা মনসব্‌দার সাহেবের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি আদেশ পাইয়াই এরূপ করিতেছি। আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে যেন তিনি নিজে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন।"

"তাহাই হইবে," খাপা হইয়া মকদুম শাহ চলিয়া গেলেন।

সৈন্যের আয়োজন তেমনি চলিতে লাগিল। একদিন মনসব্‌দার চল্লিশ জন অশ্বারোহী লইয়া আগমন করিলেন। মেজাজ গরম, মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন আরও স্পষ্ট। না বসিয়াই তিনি বলিলেন, "বিহারীলাল চৌধুরী, আগুন লইয়া খেলা করিলে হাত পুড়িবে ইহাতে বিচিত্র কি? আমি তোমার নিকট উপকৃত, তাহা ভুলি নাই, কিন্তু যাহার নিমক খাই, তাহার কাছে নিমকহারামী করিতে পারি না। তুমি

বিদ্রোহীর আচরণ করিতেছ, অতএব তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম ; এ মহকুমার শান্তির জন্য আমি দায়ী।"

বিহারীলাল স্মিতমুখে মনসবদারের কথা শুনিতেছিলেন ; কহিলেন, "আপনি কি আমার গ্রেপ্তারির আদেশ পাইয়াছেন ?"

"কাহার আদেশ ? এখানে হুকুম ত আমার। ইচ্ছা করিলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে ফাঁসি দিতে পারি।"

"বটে ? বাহিরে কে আছ ? পুণ্ডরীক !

পুণ্ডরীক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত, বিহারীলালের মুখ দেখিয়া অসিমুষ্টিতে হাত দিল। বিহারীলালের মুখের হাসি তখনও মিলায় নাই, কিন্তু মুখের ভাব বড় কঠিন, নিশিত খড়্গের ন্যায় চক্ষু জলিতেছিল।

"পুণ্ডরীক, বাহিরের অশ্বারোহীদিগকে ঘেরাও কর। যদি বল প্রকাশ করে, কাটিয়া ফেল।"

পুণ্ডরীকের শিক্ষা হইয়াছিল ভাল। দরজার দিকে এক পদ আগাইয়া বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইল। দেখিতে দেখিতে এক শত অশ্বারোহী উলঙ্গ অসি হস্তে মনসবদারের অশ্বারোহীদিগকে ঘিরিল।

মনসবদারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "ইহাকে গ্রেপ্তার কর !"

পুণ্ডরীক কলের মত ঘুরিয়া মনসবদারের পাশে গিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিল।

বিহারীলাল বজ্রকঠিন স্বরে, অথচ ধীরে কহিলেন, "জলালুদ্দীন মনসবদার, এখন যদি তোমাকে আমার বাড়ীর বাহিরে গাছে লট্‌কাইয়া দিই, তাহা হইলে কে তোমাকে রক্ষা করে ?"

মনসবদার ভীরু প্রকৃতির লোক নহেন, আর সত্য সত্যই যে

বিহারীলাল তাঁহাকে ফাঁসি দিবেন সে আশঙ্কাও তাঁহার হয় নাই, তবে অপমানে ও ততোধিক লজ্জায় তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সে অঞ্চলের প্রধান রাজকর্ম্মচারী, বিহারীলাল ধনী হইলেও রইয়ত, তাঁহার শাসনের অধীন। তাঁহার তুলনায় বিহারীলাল বালক। সে কি না একটা সামান্য ভৃত্যের সমক্ষে তাঁহাকে এমন করিয়া অপমান করে, প্রাণদণ্ডের ভয় দেখায়। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি আমাকে আজ যে অপমান করিলে তাহার শাস্তি বাদ্‌শাহ দিবেন।"

বিহারীলাল কহিলেন, "বাদশাহ কে? আজ এক বাদশাহ, কাল অন্য বাদশাহ। যিনি বাদশাহ হইবেন তাঁহার আদেশে আমি ফৌজ জড় করিতেছি, এ কথা আপনি জানেন?"

মন্‌সব্‌দার চিন্তিত হইলেন। তবে ত বিহারীলালের পিছনে শাহজাদা রুস্তম্ আছেন! বাদশাহ এতক্ষণ জীবিত আছেন কি না তাহাই বা কে জানে? মন্‌সব্‌দার নিজে ত এ পর্য্যন্ত কোন্ ভাইয়ের দিকে হইবেন স্থির করিতে পারেন নাই। ভাল করিয়া ভিতরের কথা না জানিয়া বিহারীলালকে এ-রকম করিয়া ভয় দেখান ভাল কাজ হয় নাই। জলালুদ্দীন স্বর বদ্‌লাইলেন। নরম হইয়া কহিলেন, "তুমি যে শাহজাদা রুস্তমের আদেশে এই সকল আয়োজন করিতেছ, তাহা আমি জানিতাম না।"

"কেন, আমি ত মকদুম শাহকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আদেশ-মত এইরূপ করিতেছি। শাহজাদা কিংবা আর কাহারও নাম নাই-বা বলিলাম।"

"আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল, তুমি কিছু মনে করিও না। এখন যাহা হইয়াছে, ভুলিয়া যাও।"

সরলভাবে হাসিয়া বিহারীলাল কহিলেন, “আমি কোন কথা মনে রাখিব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

মন্‌সব্‌দার বিহারীলালের হাত ধরিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরীশঙ্করের দৌত্য

রাত্রিকালে শিবিরের মধ্যে তাঁবুতে বসিয়া শাহ্‌জাদা রুস্তম্‌, সম্মুখে গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর বলিতেছেন, "শাহজাদা, বাদশাহ মুমূর্ষু, কেবল মনের জোরে এখনও বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু আর এক সপ্তাহ কিছুতেই কাটিবে না। আপনি কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

"বাদশাহের মৃত্যুসংবাদ পাইলেই রাজধানীতে প্রবেশ করিব। সেখানে সিংহাসন অধিকার করিব।"

"আর শাহ্‌জাদা হাতিম?"

"তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে আমার জয় স্থির।"

"যুদ্ধ ব্যতীত কি আর কোন উপায় নাই?"

"আর কি উপায়?"

"কেন, সন্ধি। যদি তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যায় যে যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের কোন আশা নাই তাহা হইলে সন্ধির প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন না কেন?"

"তাঁহার যে তেমন্‌ বুদ্ধি আছে আমার ত মনে হয় না। বিশেষ, তিনি নিজের বুদ্ধিতে চলেন না, তাঁহার বুদ্ধিদাতা কতকগুলা নির্ব্বোধ চাটুবাদী।"

"যদি আপনি তাঁহাকে একটা সুবা ছাড়িয়া দেন, কিম্বা কোন অঞ্চলের প্রতিনিধি রাজা করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলেও কি তিনি বুঝিবেন না?"

"আমি তাঁহাকে কিছু ছাড়িয়া দিব কেন? আর যদি দিই, তাহা হইলে তিনি অপরের বুদ্ধিতে মনে করিবেন আমি তাঁহার অপেক্ষা হীনবল, সন্ধির চেষ্টা করিতেছি।"

"সে আশঙ্কা আছে, তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই।"

"কে চেষ্টা করিবে?"

"অনুমতি দেন ত আমি করি।"

"আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি চেষ্টা করুন, কিন্তু আমি পত্র অথবা অন্য কোন নিদর্শন দিব না।"

"তাহার প্রয়োজন নাই।"

শাহজাদা হাতিমের শিবির সেখান হইতে দুই দিনের পথ। গৌরীশঙ্কর গিয়া হাতিমের সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শাহজাদার নিকট লইয়া গেলেন। শাহজাদা মোসাহেবদিগকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাকে কয়েকজন ঘিরিয়া ছিল। সেনাপতি কহিলেন, "ইনি শাহজাদা রুস্তমের নিকট হইতে আসিয়াছেন।"

শাহজাদা কহিলেন, "কি উদ্দেশ্যে?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "শাহজাদা রুস্তমের ইচ্ছা—যাহাতে ভ্রাতৃ-বিরোধ না হয়। আপনারা দুই জনই সম্রাট হইতে পারেন না। তবে সন্ধি করিলে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিবারিত হয়।"

"তিনি সন্ধি করিতে চান?"

আপনি রাজি হইলে। যুদ্ধে ও সন্ধিতে দুই পক্ষের প্রয়োজন।"

"তাঁহার প্রস্তাব কি শুনি?"

"তিনি আপনাকে দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি রাজা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।"

"আর তিনি সম্রাট্ হইবেন ?"

মোসাহেবরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "এই ত সহজ মীমাংসা ! শাহজাদা, আপনি দক্ষিণে ফিরিয়া চলুন !"

শাহজাদা বলিলেন, "যে প্রস্তাব রুস্তম্ করিয়াছেন, মনে করুন সেই প্রস্তাব আমার পক্ষ হইতে করা হইল। তাঁহাকে আমি একটা সুবা ছাড়িয়া দিব।"

"এমন করিয়া সন্ধি হয় না।"

"সন্ধির কথা আমি তুলি নাই। আমি জ্যেষ্ঠ, সিংহাসন আমার।"

"যে বলবান্ সিংহাসন তাহার। শাহাজাদা রুস্তম্ আপনার অপেক্ষা বলবান্।"

একজন মোসাহেব বলিল, "গুস্তাকি !"

হাতিম কহিলেন, "কে বলবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে। সন্ধিতে ছল থাকিতে পারে, বল নাই।"

"এই আপনার শেষ কথা ?"

"আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

গৌরীশঙ্কর ফিরিয়া আসিলেন।

শাহজাদা রুস্তম্ সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মন্‌সব্‌দার কি স্থির করিলেন

মন্‌সব্‌দার কেল্লাতে ফিরিতেই একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। মন্‌সব্‌দার একটা দেশের শাসনকর্ত্তা, এমন কি বাদ্‌শাহের সমান বলিলেই হয়। তাঁহাকে কি না দুই বিঘার আসামী একটা হিন্দু গ্রেপ্তার করে, তাঁহার সওয়ারদের ঘেরাও করে! সৈন্যেরা আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "হুকুম পাইলে আমরা এখনি গিয়া সেই দুইটা লোকের মুণ্ড বর্শায় গাঁথিয়া আনি, আর তাদের লাশ শকুনি দিয়া খাওয়াই।"

শুনিয়া মন্‌সবদার মক্‌দুম্ শাহকে ডাকিয়া বলিলেন, "উহাদের গোলমাল করিতে বারণ কর। বুঝাইয়া বল যে, গোলমাল করিলে সব ফাঁসিয়া যাইতে পারে। বল যে আমি সব ঠিক করিয়া, সময় বুঝিয়া পূরা বদলা লইব, ঐ হিন্দুটা ও তাহার বানরটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিব, সৈন্যেরা বাড়ীর অওরতদের বেইজ্জত করিবে, বাড়ীর একখানা ইট থাকিবে না। কিন্তু হল্লা করিলে গোল বাধিয়া যাইবে।"

"শিকারের দিন মন্‌সব্‌দারকে যখন বিহারীলাল সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তখন শেখ জলালুদ্দীন সাহেব কি বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে?"

মক্‌দুম শাহ কথাটা খুব রংদার করিয়া সৈন্যদিগকে শুনাইলেন। তাহারা চেঁচামচি বন্ধ করিল কিন্তু তাহাদের আস্ফালন বাড়িল। সব চেয়ে সুন্দরী অওরত কে লইবে এই কথায় ঘোর তর্ক বাধিল। কেহ-বা

কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া কহিল, "এই দিয়া বিহারীলালের দিল্ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কুত্তাকে দিয়া খাওয়াইব।"

অন্দরমহল হইতে খোজা আসিয়া মন্‌সব্‌দারকে বলিল, "বেগম সাহেবারা হুজুরের ইন্তজারি করিতেছেন।"

মন্‌সব্‌দার বলিলেন, "যাইতেছি।"

বেগম-মহলেও একটা সোরগোল হইতেছে।

মন্‌সব্‌দার বেগম-মহলে গিয়া দেখেন, তিন বেগম একত্রে, কাহার মহলে যাইবেন বিচার করিবার প্রয়োজন হইল না।

ফাতেমা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। কহিলেন, "এখন রাগারাগির সময় নয়, কি হইয়াছে বল।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "বিহারীলাল আমার অপমান করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবে, কিন্তু এ-কথা লইয়া গোল করিবার আবশ্যক নাই।"

খদিজা কহিলেন, "আমরা স্ত্রীলোক, আমরা আবার কি গোল করিব? গোল করিতেছে অন্য লোক। আমরা ভয় পাইয়াছি। বিহারীলালের পিছনে কোন ক্ষমতাবান লোক না থাকিলে সে কোন্ সাহসে তোমার অপমান করিবে?"

"তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া। সে ত বিদ্রোহী হইয়াছে, বিদ্রোহীর পক্ষে কে হইবে?"

"তবু আমাদের মন স্থির হইতেছে না।"

"তোমরা মিছামিছি ভয় পাইতেছ। ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।"

মন্‌সব্‌দার বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। ফতেমা তাঁহার সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গিয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আমার মনে আর কিছু নাই।"

"তবে আজ আমার মহলে আসিবে?"

"আসিব।"

বাহিরে আসিয়া মন্‌সব্‌দার দেখেন, শাহজাদা হাতিমের গুপ্তচর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। চর সেলাম করিয়া তাঁহার হস্তে পত্র দিয়া কহিল, "জরুরি।"

পরোয়ানায় লেখা আছে, মন্‌সব্‌দার এ পর্য্যন্ত কোন সাফ জবাব দেন নাই বলিয়া শাহজাদা নারাজ হইয়াছেন। বাদশাহ মৃত্যুশয্যায়, এ পরোয়ানা পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি মন্‌সব্‌দার শাহজাদার মেহেরবাণী ও নিজের পদোন্নতি চাহেন, তাহা হইলে অবিলম্বে শাহজাদাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবেন ও শত্রু-পক্ষের সকলকে বন্দী করিবেন।

কে কাহাকে বন্দী করে? বিহারীলাল শত্রুপক্ষে, সে ত আজ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল। মন্‌সব্‌দার দূতকে কহিলেন, "হুকুম আমি তামিল করিব। তুমি গিয়া সুবাদার সাহেবকে জানাও।"

"আপনি জবাব লিখিয়া দিবেন না?"

"না, পথে শত্রু আছে, জবাব ধরা পড়িতে পারে, তোমারও প্রাণ যাইবে।"

গুপ্তচর চলিয়া গেল। মন্‌সব্‌দার স্থির করিলেন, পর দিবস বিহারীলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মন্‌সব্‌দার ও বনবাসিনী

পর দিবস প্রভাতে মন্‌সব্‌দার একজন মাত্র অনুচর সঙ্গে করিয়া বিহারীলালের গৃহে গমন করিলেন। বিহারীলাল বাড়ীতে নাই, দুই তিন ক্রোশ দূরে একটা বাগানবাড়ীর মত ছিল সেইখানে ছিলেন। মন্‌সব্‌দার ঘোড়া হাঁকাইয়া সেই দিকে চলিলেন।

প্রকাণ্ড ময়দানের মাঝখানে বাগান দিয়া ঘেরা বাড়ী। দূরে অসংখ্য তাঁবু পড়িয়াছে। সৈন্য-শিবির। বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া সিপাহী। সে মন্‌সব্‌দারের পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে প্রয়োজন?"

"চৌধুরী বিহারীলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"ভিতরে যান," সিপাহী পথ ছাড়িয়া দিল। অনুচরকে কহিল, "তুমি এইখানে থাক, ভিতরে যাইবার হুকুম নাই।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দরজার সম্মুখে গৌরীশঙ্করের দলের কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। কেহ কিছু বলিল না। দরজা খোলা দেখিয়া মন্‌সব্‌দার ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইলেন।

প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই বনবাসিনী! মুখে মৃদুমন্দ মধুর হাসি।

বিস্ময়ের অবসানে মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি এখানে?"

"কোন আপত্তি আছে?"

"এখানে ত বিহারীলাল থাকেন।"

"থাকেন না, আজ আসিয়াছেন। অন্য লোকেরা থাকেন।"

"তুমি আর বিহারীলাল এক বাড়ীতে কেন?"!

"আপনি জিজ্ঞাসা করিবার কে?"

"আমি তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমার লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলে।"

"তাহাদের প্রভু থাকিলে তাঁহারও সেইরূপ সম্মান হইত।"

কথাটা মন্‌সব্‌দার কানেই তুলিলেন না। বলিলেন, "আমি এখনও তোমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছি।"

"আমার কি সৌভাগ্য! শাদি, না নিকা?"

"শাদি।"

"আমাকে কল্‌মা পড়াইবে কে?"

"মূল্লা, কাজি, যাহাকে বল। হিন্দু থাকিতে চাও, তোমার জুদা বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

"খুশনসীবের উপর খুশনসীব! না জানি আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম।"

মন্‌সব্‌দার অনুরাগে অন্ধ, কর্ণও বধির। বিদ্রূপের প্রত্যেক কথা তাঁহার ধ্রুব-সত্য মনে হইতেছিল।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "এখন আমার সঙ্গে যাইবে?"

"ক্ষতি কি? কাপড় ছাড়িয়া আসি।"

"আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

জয়ন্তী আর-একটা দরজার দিকে চলিল, মন্‌সব্‌দার পিছনে পিছনে। জয়ন্তী দরজার চৌকাঠ পার হইয়া দাঁড়াইল, এবার মুখের হাসি অন্য রকম। কহিল মন্‌সব্‌দার সাহেব, উল্লু কাহাকে বলে জানেন?"

"কেয়া ?"

"আর বেওয়কুফ্ ?"

"অয়সী বাত কেঁও ?"

"আপ্‌কা ইয়হ্ দো বহুৎ উম্‌দা নাম—উল্লু অওর বেওয়কুফ্।"

ঝনাৎ করিয়া জয়ন্তী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আর একটু হইলে মাথায় লাগিয়া মন্‌সব্‌দারের মাথা ফাটিয়া যাইত।

মন্‌সব্‌দারের মুখখানা তখন কি রকম হইয়া গেল ? ঠিক সেই সময় বিহারীলাল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া মন্‌সব্‌দারের সেই মুখশ্রী দেখিলেন। বিহারীলাল বাগানবাড়ীতে আসিয়াই শিবিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই মাত্র ফিরিতেছেন। তিনি বলিলেন, "কি হইয়াছে, মন্‌সব্‌দার সাহেব ? আপনি যে এখানে ?"

অপমানে ক্রোধে মন্‌সব্‌দার প্রায় বাক্‌শূন্য হইয়া ছিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিহারীলালের মনের ভাব একটু নরম হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, "বসুন, কি বলুন ?"

"এখানে নয়, ঘরের বাহিরে চলুন।"

"আসুন," বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারকে বাড়ীর পিছনে লইয়া গেলেন। সেখানে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। নানা রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

মন্‌সব্‌দারের মুখের বিকট ভাব। মাটিতে লাঙ্গল চষিলে যেমন গভীর রেখা হয়, মুখের রেখাগুলা সেইরূপ হইয়াছে, তাহার উপর ক্রোধ ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে মুখ বিকৃত। বিহারীলালের সংশয় হইতেছিল লোকটার কোনরূপ মানসিক বিকার হইয়াছে।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে

তাহা ভুলি নাই, তুমি কাল আমার অপমান করিয়াছিলে তাহা ভুলিয়াছি, কিন্তু এ নূতন অপমানের বিস্মৃতিও নাই, মার্জ্জনাও নাই।"

বিস্মিত হইয়া বিহারীলাল কহিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন ?"

"শিকারের দিন যে রমণীকে দেখিয়াছিলাম সে এখানে কেন ?"

"সে আপনার কে ? তাহার উপর আপনার কিসের দাবী ?"

"তাহাকে আমি বিবাহ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তুমি তাহাকে এখানে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ।"

"সাবধান ! আমার মার্জ্জনার অতীত কোন কথা বলিবেন না।"

"আর কথায় কাজ নাই, যুদ্ধে আপনার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি আমার পথের কণ্টক, তোমাকে সরাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

"ভীরু, কাপুরুষ, তবে বিনা যুদ্ধে মর," মন্‌সব্‌দার চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন।

মন্‌সব্‌দার ও বিহারীলালের মধ্যে একটা ছায়া পড়িল। সেই হাস্যমুখী বনবিহারিণী !

জয়ন্তী কহিল, "মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন সাহেব, দেখিতেছি আপনাদের একটা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমি মধ্যস্থ হইতে আসিয়াছি। আমার শালিসী মঞ্জুর করুন।"

"তোমাকে লইয়াই বিবাদ। তুমি আমার সঙ্গে চল, আর কোন বিপদ থাকিবে না।"

"মন্‌সব্‌দার সাহেব, ইহার মীমাংসা সহজ। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আপনি যুদ্ধ করিবেন কেন ? যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিয়া

আমাকে আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন। আমি স্বেচ্ছায় আপনার অনুগামিনী হইব।"

বিহারীলাল ডাকিলেন, "জয়ন্তী!"

হাত তুলিয়া জয়ন্তী নিষেধ করিল। তাহার কটাক্ষে বিহারীলাল বুঝিলেন, আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আর কোন কথা কহিলেন না।

"জয়ন্তী! বড় মিঠা নাম! আমি বদ্‌লাইয়া বিবি জহুরন্ রাখিব।"

নামটা কুৎসিত। বিহারীলালের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

জয়ন্তী হাত বাড়াইয়া কহিল, "চৌধুরী সাহেব, আপনার তরবারি!"

বিহারীলাল বিনা বাক্যে কটি হইতে অসি কোষমুক্ত করিয়া জয়ন্তীর হাতে দিলেন।

মন্‌সব্‌দার মনে করিলেন, জয়ন্তী রঙ্গ করিতেছে। গোঁফ দাড়ির মধ্য হইতে দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ কে কোথায় শুনিয়াছে? আর বিবি, যুদ্ধে কাজ কি, আমি ত তোমার কাছে হারিয়াই আছি! তোমার কটাক্ষেই মরিয়া আছি।"

বিহারীলালের মুখ ম্লান হইয়া গেল। অধর দংশন করিয়া নীরব রহিলেন।

জয়ন্তী কহিল, "যদি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কর, তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল, আমার গোলাম হইয়া আমার ঘরে ঝাড়ু লাগাইবে।"

বিহারীলালের ললাট পরিষ্কার হইল। মন্‌সব্‌দার অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "বেতমিজ অওরত!"

জয়ন্তী বার কয়েক তরবারি ঘুরাইল। সূর্য্যের প্রভাত-আলোকে অসি চমকিতে লাগিল।

ফুলে ফুলে চারিদিক্ ভরিয়া রহিয়াছে। এই কি রক্তপাতের স্থান!

মূঢ় মন্‌সব্‌দার দেখিলেন, এ তরবারি-চালনা ছেলেখেলা নহে, বিচিত্র শিক্ষার পরিচয়। এ ত ভয়ানক স্ত্রীলোক!

জয়ন্তী কহিল, "আসুন, আমি আপনার অপেক্ষা করিতেছি।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসিযুদ্ধ! তুমি তরবারি ফিরাইয়া দাও।"

"তবে কি বিনা যুদ্ধে মরিবেন?"

মন্‌সব্‌দারও বিহারীলালকে এই কথা বলিয়াছিলেন। জয়ন্তী শুনিয়াছিল।

মন্‌সব্‌দার ভাবিতেছিলেন, লোকে এ-কথা শুনিলে কি বলিবে?

জয়ন্তী বলিল, "কোন কোন ঘোড়া আপনি চলে, কোনটা বা চাবুক না খাইলে চলে না। আপনার চাবুক চাই?" বলিয়াই চক্ষের পলক না পড়িতে, জয়ন্তী তরবারির চ্যাপ্টা দিক্ দিয়া ধাঁ করিয়া মন্‌সব্‌দারের গালে আঘাত করিল। ঠিক যেন একটা প্রচণ্ড চড়। মন্‌সব্‌দারের গাল ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল।

চাবুকের ফল তখনি ফলিল। মন্‌সব্‌দার অশ্রাব্য কটু গালি দিয়া, তরবারি টানিয়া জয়ন্তীকে এত বেগে আক্রমণ করিলেন যে, আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে জয়ন্তীর শিরশ্ছেদন হইত। সে অবলীলাক্রমে, হাসিমুখে মন্‌সব্‌দারের আঘাত ব্যর্থ করিল।

জয়ন্তীর অসি-চালনা দেখিয়া বিহারীলাল বুঝিয়াছিলেন যে,

জয়ন্তীকে পরাজয় করা সাধারণ কথা নয়। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রোধে অস্থির হইয়া মন্‌সব্‌দার বার বার জয়ন্তীকে আক্রমণ করিলেন। কখন মস্তকে, কখন স্কন্ধে, কখন হস্তে, কখন দক্ষিণে, কখন বামে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোথাও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। জয়ন্তীর মুষ্টিতে অসি অলাতচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছিল। যেখানে মন্‌সব্‌দার লক্ষ্য করেন সেখানেই জয়ন্তীর তরবারি। মন্‌সব্‌দার বুঝিলেন যে, শিক্ষায় জয়ন্তী তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর একপদ অগ্রসর হইয়া জয়ন্তী মন্‌সব্‌দারকে আক্রমণ করিল। বিড়াল যেমন মুষিককে লইয়া খেলা করে, মন্‌সব্‌দারকে লইয়া জয়ন্তী সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে শত বার তাঁহাকে শত স্থলে আঘাত করিতে পারিত, কিন্তু দুই একবার স্পর্শ করিল মাত্র। অবশেষে তরবারিতে তরবারি জড়াইয়া মুষ্টি ঘুরাইতেই মন্‌সব্‌দারের তরবারি তাঁহার হস্তমুক্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। মন্‌-সব্‌দার নিরস্ত্র, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। জয়ন্তীর চক্ষের দৃষ্টি বড় কঠিন, তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কহিল, "কেমন, এখন আমার গোলামী স্বীকার করিবে?"

মন্‌সব্‌দার অধোবদন। আর কোন্ মুখে কথা কহিবেন?

জয়ন্তী কহিল, "এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তুমি বিদায় হও। কিন্তু আবার যদি তোমার মুখে স্পর্দ্ধার কথা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তোমার জিহ্বা ছেদন করিব।"

মন্‌সব্‌দার তরবারি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিহারী-লালের সহিত পরামর্শ হইল না। কেল্লায় গিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন,

বাদশাহ বিহিশ্‌তে এবং শাহ্‌জাদা হাতিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে যে বাদশাহ্‌ স্বীকার না করিবে, সে বিদ্রোহী।

মন্‌সব্‌দার বিদায় হইলে জয়ন্তী বিহারীলালকে তরবারি ফিরাইয়া দিল। বিহারীলাল তরবারি মাথার উপর তুলিয়া কহিলেন, "জয়ন্তীর জয়, জয় জয়ন্তী!"

কে যেন জয়ন্তীর সকল তেজ, সকল বল, হরণ করিল; সে শিথিল আলস্যে বিহারীলালের গলায় হাত দিয়া বলিল, "আমাকে ভিতরে লইয়া চল।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তখ্‌ৎ তাউস

অপমানে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া জলালুদ্দীন যে কথা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, না জানিয়া মন্‌সব্‌দার রটাইয়াছিলেন। বাদশাহ্ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, হাতিমও আপনাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেকে বাদশাহ বলা ও বাদশাহী হস্তামলকের মত হস্তগত হওয়ায় অনেক প্রভেদ। যতক্ষণ হাতিম ঘোষণাপত্র চারিদিকে প্রচার করিতেছিলেন রুস্তম্ ততক্ষণ রাজধানী বেষ্টন করিয়া সকল দরজা আঁটিয়া দিলেন। রাজধানীর ভিতর বাদশাহের মৃতদেহ—আর তখ্‌ৎ তাউস।

কোলাহলপূর্ণ মহানগরী এখন নিস্তব্ধ। মৃত্যুর অজ্রীল যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া নগরীর উপরে বসিয়া আছেন, তাঁহার পক্ষতলে সব অন্ধকার। হাট বাজার সব বন্ধ, পথে লোকের চলাচল নাই। কেহ জোরে কথা কয় না, কোথাও হাসি শোনা যায় না। জঁহাপনাহ্— জগৎশরণ নাই,—আজ ধরণী অশরণ হইয়াছে।

বিশাল রাজপ্রাসাদ আজ শোকমগ্ন! দ্বারে প্রহরী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। কর্ম্মচারীদের মুখে কথা নাই, অমাত্য ভৃত্য নিঃশব্দে যাতায়াত করিতেছে। শয়ন-প্রকোষ্ঠে বাদশাহের মৃতদেহ। বক্ষের উপর কোরাণ শরীফ, তাহার পাশে তসবি। শয্যাতলে মৃতদেহ রক্ষা করিবার আধার, দরিদ্র ভিক্ষুকের দেহ যাহাতে রক্ষা করা হয় সেইরূপ। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাদশাহ এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

জীবিতাবস্থায় যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ ভিক্ষুকের দেহের ন্যায় সমাধিস্থ হইবে।

নানা মণিমাণিক্যে খচিত, হীরকমণ্ডিত সিংহাসন আজ শূন্য। যিনি নির্ব্বিবাদে তখ্‌ৎ তাউসে আসন গ্রহণ করিতেন তিনি ধরাধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন রক্তস্রোত প্রবাহিত না করিয়া সে আসন কেহ অধিকার করিতে পাইবে না। এই মণিময় ময়ূরের পদ শোণিতে রঞ্জিত।

নগরে বা প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া শাহ্‌জাদা রুস্তম্‌ নগরদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, বাদশাহের দেহ তিনি নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া সমাধি-স্থলে লইয়া যাইবেন।

শাহ্‌জাদা হাতিম আসিয়া দেখিলেন, নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ, মক্ষিকা প্রবেশের ছিদ্র কোথাও নাই। যাবৎ বাদশাহের সমাধি না হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধের কোন কথাই হইতে পারে না। শাহ্‌জাদা হাতিম বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বাদশাহের দেহ নিজের স্কন্ধে বহন করিতে চাহেন। শাহ্‌জাদা রুস্তমের জবাব আসিল যে, শাহ্‌জাদা হাতিম পাঁচজন অনুচর লইয়া কফন হইবার কালে নগরে প্রবেশ করিতে পারেন। কেহ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, সেজন্য শাহ্‌জাদা রুস্তম্‌ স্বয়ং দায়ী। কিন্তু সমাধির পরে তাঁহাকে নিজের শিবিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। হাতিম ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

বাদশাহের মৃতদেহের সম্মুখে দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। দুই-জনের চক্ষে তখ্‌ৎ তাউস দুই জনকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে। যখন তাঁহারা বদশাহের দেহ বহন করিতেছেন তখনও তাঁহাদের মধ্যে তখ্‌ৎ তাউস রুধির-রঞ্জিত চরণে দাঁড়াইয়া মণিময় চক্ষু দিয়া দুই জনকে

আহ্বান করিতেছে! সমাধি সমাপ্ত হইলে দুই জনে নিজের শিবিরে চলিয়া গেলেন।

পর দিবস হাতিম রুস্তম্‌কে আক্রমণ করিলেন। রুস্তম্‌ নগরদ্বার ছাড়িয়া দিয়া ময়দানে সৈন্য সাজাইয়াছিলেন। সারাদিন যুদ্ধ হইল। সন্ধ্যার সময় হাতিমের সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। হাতিম বন্দী হইলেন। দুর্গের ভিতর এই রকম সম্রাট্‌-বংশের বন্দী রাখিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল। সেইখানে হাতিম রাত্রি যাপন করিলেন।

মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির পর কারারক্ষী হাতিমকে রুস্তমের নিকট লইয়া গেল। দরবার-ই-আমে তখ্‌ৎ তাউসে বসিয়া শাহ্‌জাদা রুস্তম্‌। তখ্‌ৎ তাউসের কুহক! নীচে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া গৌরী-শঙ্কর। আর কেহ ছিল না। শাহ্‌জাদা রুস্তমের সেখানে বসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রকাশ্যে বসিতেও পারিতেন না। মাতমের, লোকের অশৌচের কাল অতীত না হইলে বাদশাহ দরবারে বসিতে পারেন না। তিনি বসিয়াছিলেন কেবল মনের ও প্রতিহিংসার তৃপ্তির কারণে—তখ্‌ৎ তাউসে বসিয়া মনের তৃপ্তি, আর শাহ্‌জাদা হাতিমকে দেখাইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি।

বাদশাহের সমক্ষে কেহ বসে না। রুস্তম্‌ এখনও ন্যায়মত বাদশাহ্‌ হন নাই, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া বাদশাহীর পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। গৌরীশঙ্কর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি দরবারে কখন প্রবেশ করিবেন না। তাই আজ বাদশাহ্‌ তাঁহাকে ডাকাইয়া বসাইয়াছিলেন। ইচ্ছা, হাতিমের সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত তাঁহার সাক্ষাতেই হয়।

হাতিমের সঙ্গে শুধু একজন প্রহরী ছিল। হাতিমকে রুস্তম্‌ বসিতে বলিলেন না, হাতিম দাঁড়াইয়া রহিলেন। রুস্তম্‌ নিষ্ঠুর হাসি

হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে বিনাযুদ্ধে রাজ্যের একাংশ দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, তখন তুমি কর্ণপাত কর নাই। এখন ?"

হাতিমের মুখ শুষ্ক, চক্ষের কোলে কালি পড়িয়াছে, বেশ অসংযত। কিন্তু চক্ষের দীপ্তি ম্লান হয় নাই, মুখের গর্ব্বিত ভাব দূর হয় নাই, মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে ভ্রাতার প্রতি চাহিয়া ছিলেন। যে পিতার পুত্র রুস্তম্, সেই পিতার পুত্র হাতিম। তাঁহারও তাইমুর-বংশে জন্ম, মৃত্যুভয় নাই। তিনি সগর্ব্বে কহিলেন, "এখন ? এখন তুমি তখ্‌ৎ তাউসে, আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। জয়-পরাজয় যুদ্ধের নিয়ম, এ যুদ্ধে জিতিলে তখ্‌ৎ তাউস্, হারিলে মৃত্যু। ভাইয়ে ভাইয়ে চিরকাল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বাল্যাবস্থা হইতে বিরোধ। হয় মায়ের স্নেহ, না হয় বাপের আদরের জন্য কলহ। শৈশবে, কৈশোরে ঈর্ষা বিবাদ। সম্পত্তির জন্য, পিতৃসম্পত্তির অংশের জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি না হয় ? ইসাইয়ের ধর্ম্মগ্রন্থ জান ? আদমের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে হত্যা করিল কেন ? তাহাদের কি সম্পত্তি ছিল ? পিতা বর্ত্তমান, কলহের কোন কারণ ছিল না, কেন ভ্রাতৃহত্যা করিয়া কেইন ললাটে আততায়ীর চিহ্ন ধারণ করিল ? সম্রাটের সম্পত্তির জন্য ভ্রাতা ভ্রাতাকে হত্যা করিবে, ইহাতে বিচিত্র কি ? এখন ? এখন তুমি তখ্‌ৎ তাউসে, তোমার মস্তকে অসংখ্য হীরকের প্রভাশালী বাদশাহী তাজ ; আর আমার ছিন্ন মুণ্ড তখ্‌ৎ তাউসের নীচে ধূলায় ! দেখ, দেখ রুস্তম, তখ্‌ৎ তাউসের নীচে রক্তপ্রবাহ, রক্তে চারিদিক্ ভাসিয়া যাইতেছে, তোমার পদদ্বয় রক্তে ডুবিয়া গিয়াছে ! কেবল রক্ত, রক্ত, রক্ত, রক্তে সব ডুবিয়া গেল।"

হাতিম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওষ্ঠে ফেন, চক্ষে উন্মত্ততা। রুস্তম্ শিহরিয়া তখ্‌ৎ তাউস ত্যাগ করিয়া নীচে দাঁড়াইলেন, দৃষ্টি

তখ্‌ৎ তাউসের নীচে। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া রুস্তম্‌ কহিলেন, “উহাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও, আমি উহাকে আর দেখিতে চাহি না।”

এই কথায় হাতিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

গৌরীশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন উঠিয়া হস্তদ্বারা প্রহরীকে যাইতে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, “সম্রাট্‌, ভ্রাতৃহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবেন না।”

রুস্তম্‌ রাগিয়া উঠিলেন, “আমি অপরাধী? আমি অপরাধীর বিচার করিয়া শাস্তি দিতেছি।”

“আপনি বিচার করিবার কে?”

“আমি সম্রাট্‌, কোটি প্রজার জীবন-মৃত্যু আমাব কথায় নির্ভর করে।”

“প্রজার। কিন্তু ভ্রাতার নয়।”

“ভ্রাতাও আমার আজ্ঞার অধীন।”

“সম্রাট্‌, আদমের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ললাট-চিহ্ন আপনিও ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন?”

অঙ্গে আঘাত যেরূপ লাগে, রুস্তমের মনে এই কথা সেইরূপ বাজিল। কহিলেন, “আপনার বড় স্পর্দ্ধা!”

“আপনার আত্মবিস্মৃতি হইতেছে। এই সাম্রাজ্য আমি স্বহস্তে আপনাকে দিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে শাহজাদা হাতিম আপনার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন। যিনি সম্রাটের সম্রাট্‌ আমি তাঁহাকেই জানি।”

রুস্তম্‌ এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

গৌরীশঙ্কর কহিতে লাগিলেন, “সম্রাট, আপনার পিতৃবিয়োগ

হইয়াছে—এখনও এক সপ্তাহও হয় নাই। ইহারই মধ্যে আপনি ভ্রাতৃহত্যা স্বরূপ মহাপাপ করিতে প্রস্তুত, ভ্রাতার শোণিতে আপনার হস্ত কলুষিত করিতে চাহিতেছেন? সম্রাট্ হইয়া ইহাই কি আপনার উপযুক্ত প্রথম কার্য্য? ভ্রাতার রক্তে সিংহাসন রঞ্জিত করিবেন? সম্রাট্ রুস্তম্, এ অবসর উদারতার, প্রতিহিংসার নহে। হাতিমকে আপনি মুক্তি দিলে তিনি আপনার কি ক্ষতি করিতে পারেন? আপনার সন্ধির প্রস্তাব যেরূপ ছিল সেইরূপ থাকুক। দাক্ষিণাত্য ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিন্। উনি আপনার আজ্ঞাকারী প্রতিনিধি হইয়া দেশ শাসন করুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, শাহ্জাদা হাতিম হইতে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

অবনত মস্তকে সম্রাট্ রুস্তম্ কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর গৌরীশঙ্করের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিব।"

"শাহজাদাকে মুক্ত করিয়া নগরে ঘোষণা করুন যে, আপনার প্রতিনিধি হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। তাহা হইলে আপনার সিংহাসন তখ্ৎ-তাউসে নহে, প্রজার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবে। আপনার মঙ্গল হউক!"

সম্রাট্ রুস্তম্ ভ্রাতার নিকটে গিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিলেন। গদগদ স্বরে কহিলেন, "ভাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর!"

হাতিম রুস্তম্কে আলিঙ্গন করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

তখৎ তাউসের রত্নরাশির জ্যোতি যেন ম্লান হইয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মন্‌সব্‌দারের মৃত্যু

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন হাতিমকে বাদশাহ ঘোষণা করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিহারীলাল, জয়ন্তী, দুই জনই তাঁহার শত্রু, দুই জনকেই বিনাশ করিতে হইবে। বিহারীলাল তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জয়ন্তীকে হরণ করিয়া তিনি জলালুদ্দীনকে কৃতজ্ঞতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। মন্‌সব্‌দারের বিবেচনা-শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল। মনে মনে তিনি জয়ন্তীকে যে কতবার খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন তাহার সংখ্যা নাই। এত রকম উৎকট সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে উদয় হইতে লাগিল যে, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। কেমন করিয়া প্রতিশোধ পূর্ণ হইবে, কেমন করিয়া তিল তিল করিয়া পিশাচীকে হত্যা করিবেন? শুধু হত্যা? তাহা ত কিছুই নহে, মৃত্যু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আরও গুরুতর শাস্তি আছে। জলালুদ্দীনের পৈশাচিক প্রকৃতি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু জয়ন্তী ও বিহারীলাল ত এখনও তাঁহার হস্তগত হয় নাই। যুদ্ধ ত হইবেই কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনও কৌশলে এই দুইজনকে ধরা যায় না?

মকতুম্‌শাহের সহিত মন্‌সব্‌দার পরামর্শ করিলেন। বিহারী-লালের সৈন্য সংখ্যা কত? দুই হাজার হইবে। মন্‌সব্‌দারের এক হাজারের অধিক সৈন্য মজুদ, অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিলে আরও এক হাজার হইবে। তাহারা কয় দিনে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে? মকতুম্‌শাহের অনুমান দুই দিনে সকল সৈন্য একত্র করা

যায়। অগত্যা মনসবদার দুই দিন অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সকল সৈন্য সংগৃহীত হইলে মনসবদার স্থির করিলেন, রাত্রে বিহারীলালকে আক্রমণ করিবেন। প্রথমে পাঁচ শত সৈন্য লইয়া বিহারীলালের বাগান-বাড়ী ঘেরাও করিয়া, বিহারীলাল ও জয়ন্তীকে বন্দী করিয়া আনিবেন। বাকি সৈন্য পিছনে থাকিবে। যুদ্ধ হইলে মনসবদারের জয় নিশ্চিত, কারণ, তাঁহার সৈন্য শিক্ষিত, কতবার যুদ্ধ করিয়াছে, বিহারীলালের সৈন্য চাষার দল, লাঙ্গল দেওয়া তাহাদের কাজ, কোনও পুরুষে তাহারা যুদ্ধ করে নাই।

মনসবদারের হিসাব ও খবর পাকা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার হিসাব সমস্তই ভুল। বিহারীলাল বা জয়ন্তী, দুই জনের কেহই বাগান-বাড়ীতে ছিলেন না। বাগান-বাড়ীতে ছিল পুণ্ডরীক, তাহাও বাড়ীর ভিতর নয়, বাহিরে পাঁচ শত সৈন্য লইয়া বনে লুকাইয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্য হইয়া বিহারীলাল আর এক দিকে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। বিহারীলাল মনসবদারের সকল সন্ধান রাখিতেন, মনসবদার কিছুই জানিতেন না। অন্ধকার রাত্রে মনসবদার যখন পাঁচ শত সৈন্য লইয়া বাগান-বাড়ী ঘিরিলেন, তখন সেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। থাকিবার মধ্যে এক বুড়া আর বুড়ী। মনসবদার রাগিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন।

ওদিকে পুণ্ডরীক বন হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া মনসবদারের পাঁচ শত সৈন্য বেষ্টন করিল। বাকি দেড় হাজার সৈন্য লইয়া বিহারীলাল মনসবদারের অবশিষ্ট সৈন্যের পথ রোধ করিলেন। অন্ধকারে অল্প-স্বল্প যুদ্ধ হইল কিন্তু উভয় পক্ষ প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রভাত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে চাষাদিগকে মনসবদার তাচ্ছিল্য করিতেন বিহারীলাল ও পুণ্ডরীকের শিক্ষায় তাহারা

উত্তম সৈনিক হইয়া উঠিয়াছিল। মন্‌সব্‌দারের সৈন্যেরা তাহাদের সম্মুখে হটিতে লাগিল। মন্‌সব্‌দার নিজে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে পুণ্ডরীক।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "এ বানরটা কোথা হইতে আসিল ? ইহাকে কাটিয়া ফেল।"

পুণ্ডরীক বিচিত্র কৌশলে তরবারির অগ্রভাগ দিয়া মন্‌সব্‌দারের পাগড়ি তুলিয়া লইয়া কহিল, "সাহেব, বানরের লেজ দেখিয়াছ ?"

মন্‌সব্‌দার পুণ্ডরীকের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন, তরবারি তাঁহার নিজের পাগড়িতে জড়াইয়া গেল। পুণ্ডরীক কহিল, "আগে লেজ গুটাইয়া লও, তাহার পর যুদ্ধ।"

যুদ্ধ অল্পক্ষণ হইল। দুই চারিবার অসি চালনা হইতেই পুণ্ডরীক মন্‌সব্‌দারের মাথা কাটিয়া ফেলিল। মন্‌সব্‌দার নিহত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি ও বন্ধন

বিহারীলালের বাগান-বাড়ীতে একটি ঘরে একা বসিয়া গৌরীশঙ্কর। জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এই যে জয়ন্তী। কিছু বলিবার আছে?"

"আজ্ঞা, হাঁ। এখন ত নূতন বাদশাহ হইলেন, সুবাদার ও মনসব্‌দারও নূতন। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা কি উদ্‌যাপিত হইয়াছে?"

"আমাদের আর আর কোন কর্ম্ম নাই, সকলকে ইচ্ছামত সংসার-আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছি।"

"আমার সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন?"

"কেন, তুমি যেমন আমার কন্যার মত আছ সেই রকম থাকিবে। আর তোমাকে বনে ভ্রমণ করিতে হইবে না।"

জয়ন্তীর হাতে একটা গোলাপ ফুল ছিল, তাহার পাপড়ী ছিঁড়িতে লাগিল। মুখে আর কথা নাই।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "দাঁড়াইয়া রহিলে যে? আর কিছু বলিবার থাকে ত বল না কেন?"

জয়ন্তী কহিল, "যেমন আছি তেমনি থাকিব? সংসার-আশ্রম কি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ?"

"কে বলিল?"

"না, তাহাই বলিতেছিলাম।"

"তোমার মনে কি আছে স্পষ্ট করিয়া বল না কেন? গোপন করিবার প্রয়োজন কি?"

জয়ন্তী নীরব। ফুলের পাপ্ড়ী ছিঁড়িতে লাগিল।

গৌরীশঙ্করের মুখে হাসি দেখা দিল। কহিলেন, "বিহারীলাল বাহিরে আছেন?"

"আছেন।"

"তাঁহাকে ডাক।"

জয়ন্তী বিহারীলালকে ডাকিয়া আনিল। দুই জনে পাশাপাশি গৌরীশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বিহারীলাল, তুমি জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিতে চাও?"

"আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

"তোমরা দুইজনে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, অনুমতির অপেক্ষা কেন?"

"আপনি জয়ন্তীর পিতৃস্থানীয়।"

"সত্য কথা। শুন বিহারীলাল! আমার ইচ্ছাতেই তোমাদের দুই জনের সাক্ষাৎ হয়। জয়ন্তী সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা। জাতিতে, কুলে শীলে তোমার সমান। তুমি বীর, জয়ন্তী বীররমণী, আশীর্ব্বাদ করি, দুই জনে চিরসুখী হও।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকের পরিণাম

বিহারীলালের পিতৃব্যার কাল হইয়াছিল, ঘরে বর্ষীয়সী গৃহিণীদের মধ্যে কয়েকজন দূরসম্পর্কে মাসী পিসী, কিন্তু তাঁহারা কেহ বিহারীলালের বড় একটা দেখা পাইতেন না। সুতরাং যখন প্রকাশ হইল যে, বিহারীলাল আবার বিবাহ করিবেন, তখন তাঁহার গৃহে বিশেষ কোন রূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল না।

কিছু দূরে একটা গ্রামে জয়ন্তীর সম্পর্কে এক বিধবা মাসী থাকিতেন। জয়ন্তী তাঁহার গৃহে চলিয়া গেল। বিহারীলাল সেই গ্রামে সমারোহ করিয়া গিয়া জয়ন্তীকে বিবাহ করিলেন। জয়ন্তী যখন বিবাহের পর বিহারীলালের গৃহে আসিল, তখন তাহার সঙ্গে দুইটি দাসী। একটি দেখিতে মন্দ নয়, সুন্দরী বলিলেও চলে। অপরটি মোটেই সুন্দরী নয় কিন্তু চতুরা, সর্ব্বদা হাস্যমুখী আর তাহার মুখের ধার ক্ষুরের মত। দুই জনের কাহারও বিবাহ হয় নাই। দুই জনে পুণ্ডরীকের পিছনে লাগিল। সুন্দরীর নাম সুভাগী, অসুন্দরীর নাম পার্ব্বতিয়া। পুণ্ডরীককে একা পাইলে সুভাগী হাসিয়া বলে, "তোমার নামটি ত বেশ, পুণ্ডরপুর।"

পুণ্ডরীক রাগিয়া বলে, "আমার নাম পুণ্ডরপুর কে বলিল? আমার নাম পুণ্ডরীক।"

"সে একই হইল। পুণ্ডরপুর না হয় পুণ্ডরিয়া।"

"তুমি আমার নাম কেবল খারাপ করিতেছ!"

"তোমাকে সব নামই বেশ মানায়। তা তুমি এমন সুপুরুষ, তোমার এতদিন বিবাহ হইল না কেন ?"

"আমি আবার সুপুরুষ ? তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ ?"

"এ কি বিদ্রূপের কথা, না তুমি বিদ্রূপ করিবার মত মানুষ ? সকলের চক্ষু ত সমান নয়, সকলে নিজের নিজের চক্ষে দেখে। আমি ত তোমাকে বেশ দেখি।"

পুণ্ডরীক ঘাড় নাড়িল। সুভাগী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন পুণ্ডরীকের কাছে একটু ঘেঁসিয়া গিয়া বলিল, "আমি কি দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত ?"

"কে বলিল ? তুমি ত দেখিতে বেশ।"

"তাহা হইলে তুমি আমাকে এ রকম কর কেন ?"

"আমি তোমাকে কি রকম করি ?"

"এই আমার সঙ্গে ডাকিয়া কথা কও না, আমাকে দুই. চারিটা মিষ্ট কথা বল না।"

"কেন, তুমি যখন কথা কও, আমিও তখনি কথা কই।"

"তুমি ত আমাকে ভালবাস না, কখনো আমাকে ভালবাসার কথা বল না।"

"ভালবাসার কথা ? সে কি রকম ? আমি কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি ?"

"আরে, আদরের কথা, যে রকম চৌধুরী মহাশয় আমাদের মনিবানীকে বলেন।"

"ওঃ, সে কেমন কথা আমি ত শুনি নাই। আর ওঁদের ত বিবাহ হইয়াছে।"

"বিবাহের পূর্ব্বে কখনো কথাবার্ত্তা হয় নাই ?"

"সে কোন রকম জাদু হইয়াছিল।"

"তেমন জাদু কি আমাদের হয় না ?"

"তেমন জাদু আমাদের কেন হইবে ? তুমিও বনে যাইবে না, আমিও বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইব না।"

"যাও, তুমি বড বেরসিক।"

"তাই বোধ হয়।"

কে আসিতেছে দেখিয়া সুভাগী সরিয়া গেল।

তার পর পার্ব্বতিয়ার পালা। নির্জ্জনে পুণ্ডরীককে পাইয়া বলিল, "এই যে ধূম্রলোচন! তুমি যে আমাদিগের দিকে ফিরিয়াও তাকাও না।"

"তোমরা সকলে মিলিয়া আমার নামটা কেন খারাপ কর, বল দেখি ?"

"সকলে ? আর কে শুনি ?"

"এই সুভাগী আমাকে পুণ্ডরপুর বলিতেছিল।"

"বটে ? তোমার গুণ অনেক। সুভাগীর সঙ্গেও আড়ালে কথা হয়।"

"তোমরাই আড়ালে কথা কও। আমি কি তোমাদের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই ?"

"কি আমার সাধু পুরুষ রে! তুমি আড়ালে কারুর সঙ্গে কথা কও না ?"

"আমার দরকার ?"

"আমাদেরই বড় দরকার, না ? যাও তুমি এখান থেকে।"

"যাই,"—বলিয়া পুণ্ডরীক দাঁড়াইয়া রহিল।

পার্ব্বতিয়া পুণ্ডরীকের কাছে আসিয়া কোমরে দুই হাত দিয়া কহিল, "তোমাকে জাম্বুবান বলে কেন ?"

"যে বলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

"এক জনের ত দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলে। আমি যদি বলি, তাহা হইলে কি আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে ?"

"তা কি পারি ?"

"তুমি দেখিতে ঠিক যেন জাম্বুবান।"

সুভাগী বলে, "আমি দেখিতে মন্দ নই।"

পার্ব্বতিয়া কোমর হইতে হাত নামাইল। পুণ্ডরীকের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল, "কথায় কথায় সুভাগী। কেন, সুভাগী তোমার কে হয় ?"

"যা তুমি হও, তাই।"

"আমি আবার তোমার কে ?"

"কেউ না। সুভাগীও কেউ না।"

পার্ব্বতিয়ার হাত পুণ্ডরীকের পাশে। পুণ্ডরীক সাহস করিয়া তাহার হাত ধরিল।

পার্ব্বতিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল না। পুণ্ডরীকের মুখের দিকে আড়চক্ষে চাহিয়া, রসের হাসি হাসিয়া কহিল, "তুমি যে বড় আমার হাত ধরিলে ? কে কাহার হাত ধরে জান ?"

"বল শুনি।"

"যে যাহাকে বিবাহ করে।"

"আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

"আর সুভাগী ?"

"তাহাকে বিবাহ করিতে গেলাম কেন ?"

"সে সুন্দরী।"

হউক। তুমি তার চেয়ে সুন্দরী।"

"ও সব মন রাখা কথা রাখ। কর্ত্তা মহাশয়কে কে বলিবে?"

"এই কথা রহিল।"

বিহারীলাল বৈঠকে একা বসিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময় পুণ্ডরীক কিছু সন্তর্পণের সহিত ধীরে ধীরে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত।

বিহারীলাল কহিলেন, "কি পুণ্ডরীক? কি মনে করিয়া?"

"কিছু না, অমনি একবার আসিলাম।"

বিহারীলাল পুণ্ডরীকের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "তোমার মুখ কেমন কেমন দেখিতেছি। কোন অসুখ হয় নাই ত?"

"না, না, লাল্‌জী, অসুখ হইবে কেন? এই তোমায় বলিতে আসিয়াছিলাম কি জান? তুমি ত বিবাহ করিয়াছ?"

"তা ত করিয়াছি।"

বিহারীলাল কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, ইহার ভিতর অন্য কথা আছে।

"আচ্ছা, আমি যদি একটা বিবাহ করি?"

"সে ত উত্তম কথা। আমি ধূমধাম করিয়া বিবাহ দিব। কাহাকে বিবাহ করিবে?"

"চৌধুরাণীর একটা বাদীকে।"

"সে রাজি আছে?"

"আছে বই কি! আমি কি কাহাকেও সাধি নাকি?"

পুণ্ডরীকের বুক ফুলিতে লাগিল।

"বেশ, এ ত খুসির কথা।"

ওদিকে পার্ব্বতিয়া গিয়া কোন কথা না ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জয়ন্তীকে বলিল, "চৌধুরী মহাশয়ের পুণ্ডরীক নামক লোকটা আমাকে বিবাহ করিতে চায়।"

জয়ন্তীর অধরের কোণ কুঞ্চিত হইল, চক্ষু চক্‌চক্‌ করিতে লাগিল। হাসি চাপিয়া কহিল, "তারপর ?"

"তারপর আবার কি ?"

"তাহা হইলে ত কথা ফুরাইল। আমাকে যদি আর কিছু বলিবার না থাকে তাহা হইলে আমি আর কি বলিব ?"

"তুমি যদি বল, তাহা হইলে আমি উহাকে বিবাহ করি।"

"আমি যদি বলি ? আর তোর মন কি বলে ?"

"তা মেয়েমানুষের ত একটা আশ্রয় চাই, না হয় বিয়ে কর্‌ব।"

"আচ্ছা, তাই করিস্‌।"

সুভাগী যখন শুনিল, পুণ্ডরীক পার্ব্বতিয়াকে বিবাহ করিবে, তখন সে গিয়া প্রথমে পুণ্ডরীককে ধরিল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "তোমার এ কি রকম ব্যবহার ?"

পুণ্ডরীক আকাশ হইতে পড়িল। "কেন, আমি কি করিয়াছি ?"

"তুমি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়া এখন পার্ব্বতিয়াকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ ?"

"তোমাকে কখন বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম ?"

"কেন, যখন আমার সঙ্গে আড়ালে কথা কহিয়াছিলে ? নহিলে কি আমি তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতাম, আমাকে কি সেই রকম মেয়েমানুষ পাইয়াছ ?"

পুণ্ডরীক ত পলায়ন করিল, কিন্তু তাহাতেই কি তাহার রক্ষা আছে ? সুভাগী গিয়া জয়ন্তীর কাছে কান্না জুড়িয়া দিল। কহিল,

"আমাকে বিবাহ করিবে কত বার বলিয়াছে, আমার গায় হাত দিয়া দিব্য করিয়াছে, আর এখন কি না পার্ব্বতিয়াকে বিবাহ করিবে! তাহা হইলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

জয়ন্তী ভাবিল, দাসী দুইটাকে আনিয়া ত আচ্ছা বিপদ হইল। অনেক তর্ক, অনেক বকাবকির পর স্থির হইল, সুভাগী ও পার্ব্বতিয়া দুই জনেরই সঙ্গে পুণ্ডরীকের বিবাহ হইবে।

তাহাই হইল। মাস কয়েক ত দুই সতীনে মিলিয়া পুণ্ডরীককে ছকড়া নকড়া করিয়া তুলিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া পুণ্ডরীক তাহাদের দুইজনকে বলিল, "তোমরা যদি ও-রকম কর, তাহা হইলে আমি আর বাড়ী আসিব না।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পুণ্ডরীক বাড়ী আসা বন্ধ করিল, কাছারি বাড়ীতে পিয়াদাদের একটা ঘরে বাস করিতে লাগিল। চাকর-চাকরাণী-মহলে হাসি-টিট্‌কারীর ধূম পড়িয়া গেল। সুভাগী আর পার্ব্বতিয়া লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারে না। অনেক সাধাসাধি করিয়া তাহারা পুণ্ডরীককে বাড়ী ফিরাইতে পারে না, শেষে তাহার পা ছুঁইয়া দুই জনে শপথ করিল যে, আর কখন তাহার সঙ্গে কিংবা নিজেরা ঝগড়া করিবে না। তখন পুণ্ডরীক বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহার গৃহে শান্তি হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কালচক্র

গিরণার পর্ব্বতে একটি গুহার সম্মুখে বসিয়া দুই ব্যক্তি—বালানন্দজী ও গৌরীশঙ্কর। পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে।

গৌরীশঙ্করকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বালানন্দজী কহিলেন, "প্রজার সেবা কি পূর্ণ হইল?"

"এ কার্য্যের পূর্ণতা নাই, তবে আপাততঃ ত আর কিছু করিবার নাই। অনুমতি হয় ত আমিও নিকটে কোথাও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি।"

"অতি উত্তম কথা। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া পরমার্থ চিন্তা কর।"

"আপনার যেরূপ আদেশ আমার নিজেরও সেইরূপ অভিরুচি। এই পুণ্যভূমির ভবিষ্যতে কি হইবে, কবে আবার এই ঋষিনিবাস জ্ঞানের শান্তির আলয় হইবে? যুগ পরিবর্ত্তনের কত বিলম্ব?"

"ত্রিকালদর্শী নহিলে ভবিষ্যৎ জানিবার সম্ভাবনা নাই, এখন ত্রিকালদর্শী কে? সে দেশকালভেদী যোগবল কোথায়? ভবিষ্যতের কল্পনা আমাদের পক্ষে অনুভব অনুমান মাত্র; কেন না, পূর্ব্বকালের সে একাগ্র তন্ময়তা আমাদের নাই। সামান্য সাধনায়, সামান্য

বুদ্ধিতে ভবিষ্যৎ নিতান্ত জটিল বিবেচনা হয়। ঋষিদিগের কালে কি সমগ্র ভারতে কোন সম্রাটের একচ্ছত্র রাজ্য ছিল, না ভবিষ্যতে কোন সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইবে? রাজা, রাজবংশ, সম্রাট্, সাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্বুদ মাত্র, অথচ ইহাদের ক্ষণিক চাকচিক্যে লোক মুগ্ধ হয়, সর্ব্বদাই ইহাদের কথা জল্পনা করে। প্রজা নিত্য, কারণ মানব জাতি লুপ্ত না হইলে প্রজা ধ্বংস হইবে না। কিন্তু সমগ্র জাতির কল্যাণে প্রজা কত কাল উদাসীন থাকিবে, কে বলিতে পারে? তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত ছিলে তাহা পূর্ণ হওয়াতে তোমার বিবেচনা হইতে পারে যে, বহুকাল প্রজার ও দেশের মঙ্গল রক্ষিত হইবে। তাহাই হউক, কিন্তু সে বহু কাল কত দিন? পূর্ব্বে ব্যসন, বাসনা, প্রলোভন ছিল সঙ্কীর্ণ, ত্যাগের, নিবৃত্তির, সাধনার প্রসার ছিল অবারিত। রাজ্যের জন্য এখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইতেছে, ভবিষ্যতে জাতিবিচ্ছেদ হইবে। এখন যে দুর্দ্দৈব এক দেশে হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা সর্ব্বত্র হইবে। জ্ঞাতিবিচ্ছেদে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, রাজা ও জাতিবিরোধে রাজ্য ও জাতি নাশ হইবে। যুগ-বিপ্লবের ইহাই সূচনা। ভবিষ্যৎ জানিবার উপায় কি? না, অতীতের প্রগাঢ় আলোচনা। অতীতের ছায়া ভবিষ্যতের উপর পড়ে, সেই ছায়া যে দেখিতে পায় তাহার চক্ষের সমক্ষে ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়। সে কত সাধনার ফল! ভবিষ্যদ্বাণী অন্ধের মুখ হইতেও দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু ভবিষ্যৎ জানে কে, ভবিষ্যৎ দেখিতে পায় কে? কালচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে আমরা কেবল তাহাই দেখিতেছি। এ মহাকাব্যের, এই মহাগ্রন্থের শেষ নাই, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কালের রচনা, আবার নূতন পৃষ্ঠা, আবার নূতন লিখন। যে রচনারই সমাপ্তি নাই, তাহা কে সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া উঠিতে পারে?

যে ভবিষ্যৎ অনন্ত, তাহাকে সান্ত করিয়া কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? কালচক্রের ঘূর্ণন শব্দ তোমার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে? কালের মহাকাব্যের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইবার শব্দ শুনিতে পাইতেছ? তাহাতেই ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।"

সমাপ্ত